প্রিয়নবী (সাঃ) এর জীবন-বৃত্তান্ত ও চারিত্রিক গুনাবলী সমৃদ্ধ সুহিত-সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ

মূলঃ

রবের ক্ষমার মুখাপেক্ষী

হায়ছাম বিন মুহাম্মদ জামিল সারহান

প্রাক্তন শিক্ষকঃ মসজিদে নববীস্থ হারাম ইন্সটিটিউট

তত্ত্বাবধায়কঃ আত-তাসীল আল-ইলমী ওয়েবসাইট

অনুবাদঃ

ড. কাওছার এরশাদ মহাম্মদ

মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

মহান আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত লেখক, লেখকের পিতা মহোদয় ও এই গ্রন্থ প্রকাশনায় সার্বিক সহায়তাকারী সকলকে মার্জনার বারিধারা বর্ষণ করুন। আমীন।

মূল গ্রন্থের অবতরণিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, তার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি এরং সকল প্রকার আত্মিক অনিষ্টসমূহ ও মন্দ কর্মসমূহ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না এবং তিনি যাকে বিপথগামী করেন, কেউ তাকে হিদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশিদার নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করো। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না (সূরা আল ইমরান:১০২)।

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট হক দাবী করে থাক এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক (সূরা আন-নিসা:১)।

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে (সূরা আহযাব:৭০-৭১)।

অতঃপর, যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে নবী (সা:), তাঁর জীবনবৃত্তান্ত ও পথনির্দেশনা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়ার ন্যুনতম অভিপ্রায় বদ্ধমূল, সে এ-ই সামান্য লিখনি অবগত হওয়া থেকে কখনো অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। ইবনুল কায়্যিম (রহ:) বলেছেন : উভয় জগতে বান্দার সুখ-সমৃদ্ধি যখন নবী (সা:) এর জীবনাদর্শের উপর নির্ভরশীল, ঠিক তখনি যে ব্যক্তি স্বীয়াত্মার হিতোপদেষ্টা, নাজাত ও সুখ-সমৃদ্ধকামী, তাঁর উপর নবী করিম (সাঃ) এর জীবনাদর্শ, জীবন-চরিত ও তাঁর শান-মর্যাদা সমন্ধে জানা অপরিহার্য। যা জানার মাধ্যমে সে অজ্ঞদের কাতার থেকে বের হয়ে তাঁর অনুসারীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ ও তাঁর সংগঠনের কাতারে গণনাভুক্ত হবে। সাধারণতঃ মান নবী (সাঃ) কে জানার ক্ষেত্রে তিন শ্রেনীর হয়ে থাকে :-

১। মুস্তাক্বিল (যথেষ্ট পরিমাণ জানার মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি)

২। মুস্তাকসির (অধিক জানার ইচ্ছুক ব্যক্তি)

৩। মাহরুম (একেবারে না জেনে বঞ্চিত ব্যক্তি)

আর অনুগ্রহ আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই তা দান করেন। আর আল্লাহ তো মহান অনুগ্রহের অধিকারী। আমি কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে এ-ই কামনা করি, তিনি যেন আমাকে এবং তোমাদিগকেও তাঁর নাবীর প্রেম-ভালোবাসা, তাঁর নির্দেশনার আনুগত্য এবং পরিহার্য ও বারিত বিষয়গুলো পরিহার করার শক্তি প্রদান করেন।

"হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম ('আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর (সাঃ) বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম ('আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী। আর প্রশংসা কেবলমাত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ :

রাসুল (সাঃ) এর মহৎ গুনাবলি ও নীতিমালা

রাসূল (সাঃ) এর

মহৎ গুনাবলি

বংশ পরিচয়

তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (শায়বাহ) বিন হাশিম ('আমর) বিন আবদে মানাফ (মুগীরাহ) বিন কুসাই (যায়দ) বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর (তাঁর উপাধি ছিল কুরাইশ এবং এ সূত্রেই কুরাইশ বংশের উদ্ভব) বিন মালিক বিন নাযর (ক্বায়স) বিন কিনানাহ বিন খুযায়মাহ বিন মুদরিকাহ (আমির) বিন ইলিয়াস বিন মুযার বিন নিযার বিন মা'আদ্দ বিন আদনান। আর আদনান হচ্ছেন (আল্লাহর কোরবানকৃত নবী) উপাধিতে ভূষিত ইসমাঈল বিন (আল্লাহর বন্ধু) উপাধিতে ভূষিত ইবরাহীম আলাইহিমাস সালাম এর বংশধর।

আর তিনিই ছিলেন পৃথিবীবাসীর মধ্যে কৌলিন্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেষ্ঠতর মানব। হাদীসে বর্ণিত আবু সুফয়ানকে লক্ষ্য করে হিরাকিলিয়াস এর উক্তি: আমি তোমাকে তাঁর (রাসূলের) বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। **তুমি তার উত্তরে উল্লেখ করেছ যে, তিনি (রাসূল সাঃ) তোমাদের মধ্যে সম্ভান্ত্র বংশের। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণকে তার সম্প্রদায়ের মহত্তর বংশে পাঠানো হয়ে থাকে।**

মনোনয়ন

রাসূল (সাঃ) বলেন : **মহান আল্লাহ ইসমা'ঈল ('আঃ)-এর সন্তানদের থেকে 'কিনানাহ্'-কে মনোনীত করেছেন, আর কিনানাহ্ ('র বংশ) হতে, 'কুরায়শ'-কে বাছাই করে নিয়েছেন আর কুরায়শ (বংশ) হতে বানূ হাশিমকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং বানূ হাশিম হতে আমাকে চয়ন করে নিয়েছেন।**

নামসমূহ

নবী (সাঃ) এর প্রতিটি নামই গুনবাচক নাম। আবার শুধু এমন নামবাচক নাম নয়, যা তাঁর শুধু পরিচায়ক মাত্র। বরং তাঁর নামসমূহ এমন সব উৎকৃষ্ট গুনাবলি থেকে নিস্পন্ন যা তাঁর স্তুতি ও পূর্ণ উৎকর্ষতার আবশ্যিক দাবী রাখে।

মুহাম্মাদ

রাসূল (সাঃ) এর প্রসিদ্ধ নামসমূহের অন্যতম একটি নাম। যার দ্বারা তাঁকে তাওরাত গ্রন্থে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থ: অত্যধিক বৈশিষ্টের অধিকারী প্রশংসিত।

আহমাদ

অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রশংসিত। তাঁর অত্যাধিক প্রশংসিত স্বভাব-প্রকৃতির কারণে আসমান-জমীন ও ইহকাল-পরকালবাসী সবাই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একই নামে (মাসীহ) ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা নামকরণ করেছিলেন।

আল মুতাওয়াক্কিল

অর্থাৎ, ভরসাকারী। দ্বীন প্রতিষ্ঠাকরণে তিনি আল্লাহর উপর অটল ভরসা করতঃ অন্য কারো সাথে শিরক স্থাপন না করায় উক্ত নামে অভিহিত হয়েছেন ।

নামসমূহ		
	আল মাহি	অর্থাৎ, নিশ্চিহ্নকারী : যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কুফরি নিশ্চিহ্ন করেন। তিনি ব্যতিত অন্য কারো দ্বারা তাঁর মত কুফুরী নিশ্চিহ্ন হয়নি।
	আল হাশের	অর্থাৎ, সমবেতকারী: যার পদধুলিতে মানবজাতিকে সমবেত করা হবে। যেন তিনি সকল মানবজাতীকে সমবেত করার জন্য প্রেরিত।
	আল আকেব	অর্থাৎ, পরাগত : যার পর আর কোন নবী নেই। তিনিই সর্বশেষ নাবীর মর্যাদায় অধিষ্টিত।
	আল মুকাফ্ফি	অর্থাৎ, পশ্চাদ্‌গামী : তিনি পূর্ববর্তী সকল নবীর পশ্চাদ্‌গামী। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলগনের অনুগামী করেছেন।
	নাবিয়্যুত তাওবাহ	অর্থাৎ, তওবার নবী : আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর উপর তওবার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। তদনুসারে তিনি পূর্ববর্তী জাতিদের তুলনায় তাদের তওবা উপমাহীনভাবে কবুল করেছেন। রাসূল (সা:) অধিক ক্ষমা প্রার্থনাকারী ও তওবাকারী ছিলেন।
	নাবিয়্যুল মালহামাহ	অর্থাৎ, বীরদর্প নবী: যিনি আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। অন্য কোন নবী বা তাঁর জাতি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মাতের ন্যায় আদৌ জিহাদ করেনি। এবং নবী (সাঃ) এর যুগে সংঘটিত বড় বড় যুদ্ধের সাথে তৎপূর্বে কারো ধারণা ছিলনা।
	নাবিয়্যুর রহমাহ	অর্থাৎ, দয়ার নবী : আল্লাহ তায়ালা তাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরুপ প্রেরন করেছেন। যার দ্বারা তিনি পুরো পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করেন। আর মুমিনগণ তো অনুকম্পার বৃহত্তর অংশ প্রাপ্ত হয়েছেন। অন্যদিকে কাফেররা বিশেষতঃ তাদের মধ্যে আহলে কিতাবরা তাঁর অনুগ্রহের ছায়াতলে আশ্রিত , অনুগৃহীত ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে জীবনযাপন করেছে ।
	আল ফাতেহ	অর্থাৎ, উন্মোচনকারী: আল্লাহ তায়ালা আন্দোলিত হেদায়াতের দ্বারকে তাঁর দ্বারা উন্মুক্ত করেছেন। এবং অন্ধ চক্ষু, শ্রবণশক্তিহীন কর্ণ ও আচ্ছাদিত আত্মাগুলোর তালাও খুলে দিয়েছেন। তাঁরই মাধ্যমে অসংখ্য কাফেরদের অঞ্চলের বিজয় এনে দিয়েছেন ও জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছেন। এবং তাঁরই মাধ্যমে উপকারসমৃদ্ধ জ্ঞান ও সৎ আমলের পদ্ধতিসমূহ উন্মোচন করেছেন।

নামসমূহ

আল আমিন	অর্থাৎ, বিশ্বস্ত : সমস্ত ধরণীবাসীর মধ্যে রাসূল (সাঃ) এই নামে আখ্যায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্যতর। তিনি ওহী ও দ্বীনের ক্ষেত্রে আল্লাহর একজন বিশ্বস্ত নবী এবং আসমান ও জমিনবাসী সকলের বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব। পরন্ত রাসূল হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্বেই কুরাইশরা তাঁকে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেন ।
আল বাশির	অর্থাৎ, সুসংবাদদাতা : আনুগত্যকারীর জন্য পুরস্কারের সুসংবাদদাতা এবং অবাধ্যের জন্য শাস্তির ভীতিপ্রদর্শনকর্তা।
সাইয়িদু ওলাদে আদাম	অর্থাৎ, আদম-সন্তানদের সর্দার : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: **ক্বিয়ামাতের দিন আমি আদম-সন্তানদের নেতা হব, এবং এতে কোনো অহংকার নেই।**
তাস সিরাজুল মুনির	অর্থাৎ, উজ্জ্বল প্রদীপ : যিনি দাহন ছাড়া আলো বিচ্ছুরণ করেন। প্রদীপ্ত প্রদীপ এর বিপরীতধর্মী, কেননা তাতে ধরণের দাহন রয়েছে।

আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহর একজন বিশেষ বান্দা। তাঁর মাঝে ইবাদাতের বিশেষ থেকে বিশেষত্বর অসাধারণত্ব বিদ্যমান ছিল । কেননা তিনি ইবাদাতের সমস্ত স্তরকে পূর্ণাঙ্গতায় রুপান্তরিত করেছিলেন ।

সামগ্রিকভাবে গুনাবলি

রাসূল (সাঃ) এর সামগ্রিক গুনাবলির বিবরণ যা তিনি স্বয়ং নিজেকে বিশেষায়িত করেছেন। যেমনভাবে তিনি বলেছেন : **আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি পছন্দ করি না যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে মর্যাদার স্থানে রেখেছেন, তা অপেক্ষা তোমরা আমাকে উঁচু মর্যাদার আসনে আসীন করাবে।**

রাসূল (সাঃ) শ্রেষ্ঠতর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন : **আপনি নিশ্চয়ই মহান চরিত্রের অধিকারী (সূরা ক্বলাম-৪)**। আয়েশা (রাঃ) বলেন : **কুরআনই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট**। কুরআনের দ্বারা জীবন পরিচালনা করতেন এবং এর বিধিমালা পর্যন্তই ক্ষান্ত থাকতেন। এবং কুরআনই ছিল কারো প্রতি তাঁর সন্তুষ্ট ও অসন্তোষ হওয়ার মানদণ্ড।

খলিলুল্লাহ	অর্থাৎ, আল্লাহর বন্ধু : **রাসূল (সাঃ) বলেন: আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আঃ) কে যেমন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, ঠিক সে রকমভাবে আমাকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।**

শারীরিক বৈশিষ্ট্য

দৈহিক গঠন	আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণের**। অর্থাৎ : (সাদা গোলাকৃতির ন্যায়) **তাঁর ঘাম যেন মুক্তার মতো। তিনি চলার সময় সামনে দিকে ঝুঁকে চলতেন। আমি রেশমি কাপড় বা রেশমকেও তাঁর হাতের তালুর মতো নরম পাইনি এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শরীরের চেয়ে মিশ্‌ক ও আম্বারের মাঝেও অধিক সুগন্ধ পাইনি।**

শারীরিক বৈশিষ্ট্য

দৈহিক অবকাঠামো

বারাহ বিন আযিব (রাঃ) বলেন: **নবী (সাঃ) মাঝারি গড়নের ছিলেন**। অর্থাৎ : মাঝারি গঠন আকৃতিসম্পন্ন। **তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড় চাদর পরা অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে বেশি সুন্দর আমি কখনো কাউকে দেখিনি।**

মুখমণ্ডল

কা'ব বিন মালিক (রাঃ) বলেন: **আমি নবী (সাঃ) -কে সালাম দিলাম, খুশী ও আনন্দে তাঁর চেহারা ঝলমল করে উঠলো। তাঁর চেহারা এমনি-ই খুশি ও আনন্দে ঝলমল করত। মনে হত যেন চাঁদের একটি টুকরা। তাঁর চেহারা মুবারাকের এ অবস্থা হতে আমরা তা বুঝতে পারতাম**। বারাআ (রহঃ) -কে জিজ্ঞাসা করা হল, নবী (সাঃ) -এর মুখমন্ডল কি তরবারির মত ছিল? তিনি বললেন, **না বরং চন্দ্রের মত ছিল।**

কেশগুচ্ছ

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর মুবারক হাত গোশতে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর পরে আমি কোন লোককে এমন দেখিনি। আর নবী (সাঃ) -এর চুল ছিল মধ্যম ধরণের, বেশী কোঁকড়ানোও না,** (অর্থাৎ : বক্রতাসম্পন্ন ও কুচকানো ছিল না।) **অধিক সোজাও না।** (অর্থাৎ: আলগা ছিল না।)

নয়নযুগল

জাবির বিন সামুরাহ্ (রাঃ) বলেন: **নবী (সাঃ) এর মুখ ছিল বেশ দীর্ঘ** (অর্থাৎ : চওড়া।) **চোখ দুটি ছিল লাল** (অর্থাৎ : চক্ষুদ্বয়ের সাদা অংশে রক্তিম বর্ণ ছিল)। **এবং পায়ের জঙ্ঘা ছিল শীর্ণকায়।** (অর্থাৎ : অল্প গোশতবিশিষ্ট গোড়ালি।)

ঘাম

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন: **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের ঘরে আসলেন এবং বিশ্রাম নিলেন।** (অর্থাৎ : দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।) **তিনি ঘামছিলেন, আর আমার মা একটি শিশি (ছোট বোতল) নিয়ে মুছে মুছে তাতে ভরতে লাগলেন। নবী (সাঃ) জেগে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে উম্মু সুলায়ম! একি করছ? আমার মা বললেন, এ আপনার ঘাম, যা আমরা সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করি, আর এ তো সব সুগন্ধির সেরা সুগন্ধি।**

মোহরে নবুওত

তাঁর উভয় কাঁধের মাঝে নবুয়াতের মোহর ছিল। যা তাঁর শরীরে তিলকের ন্যায় স্পষ্ট দৃশ্যমান ছিল।

জাবির বিন সামুরা (রাঃ) বলেন: **আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পিঠের উপরিভাগে (দুই কাধের মাঝে) কবুতরের ডিম সদৃশ নবুয়াতের মোহর দেখেছি। এটির রং ছিল তার গায়ের রংয়ের মতো।**

চারিত্রিক গুণাবলী

রাসূলের শানে সাহাবিদের মর্যাদা প্রদান

আমর বিন আস (রাঃ) বলেন : **আমার অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অপেক্ষা বেশি প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমার চোখে তিনি অপেক্ষা মহান আর কেউ নেই। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তাঁর প্রতি চোখভরে তাকাতেও পারতাম না। আজ যদি আমাকে তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয় তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ চোখ ভরে আমি কখনই তাঁর প্রতি তাকাতে পারিনি।**

উরয়া বিন মাসউদ আস-সাক্বাফী হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে কুরাইশদের নিকট রাসূল (সাঃ) কে সাহাবীগণের সম্মান প্রদর্শনীর ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেন : **আল্লাহর কসম, কোন রাজাকে দেখিনি, তার প্রজারা তাকে তেমন সমীহ করে, যেমন সমীহ করে মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীরা মুহাম্মদ (সাঃ) এর । আল্লাহর কসম, রাসূল (সাঃ) যদি কফ ফেলেন, আর তা কোন সাহাবীর হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা তা তাদের চেহারা ও চামড়ায় মেখে ফেলেন। তিনি কোন আদেশ দিলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তা পালনে তৎপর ছিলেন; তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো ; তিনি কথা বললে, সাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনতেন। এমনকি সমীহতে তারা তাঁর চেহারার দিকেও একদৃষ্টে তাকাতেন না।**

আল্লাহর সাথে শিষ্টাচারিতা

আব্দুল্লাহ বিন শিখখির (রাঃ) বলেন: **একদা আমরা বললাম, আপনি আমাদের নেতা। তিনি বললেন, সায়্যেদ বা নেতা তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালা । আমরা বললাম, আপনি তো আমাদের মাঝে সব চাইতে উত্তম ব্যক্তি এবং দানের বিশালতায় আপনি মহান। তিনি বললেন, তোমাদের এ কথা তোমরা বলতে পারো, অথবা তোমাদের এরূপ কিছু বলায় কোন সমস্যা নেই। তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি না বানায়।**

বীরত্ব

আলী (রাঃ) বলেন : **যুদ্ধ যখন তীব্র হয়ে উঠত এবং উভয় পক্ষ লড়াইয়ে লিপ্ত হত, আমরা তখন রাসূল (সাঃ) এর আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করতাম। ফলে তিনি ছাড়া আমাদের মাঝে কেউ শত্রুর অধিক নিকটবর্তী থাকত না।**

আল্লাহ ভীরুতা

রাসূল (সাঃ) বলেছেন : **আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি, এবং তোমাদের চেয়ে তার প্রতি বেশি অনুগত ।**

স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার

রাসূল (সাঃ) বলেছেন: **তোমাদের মাঝে সে-ই ভাল যে তার পরিবারের কাছে ভাল। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চেয়ে অধিক উত্তম।**

লাজুকতা

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন: **রাসূল (সাঃ) নিজ গৃহে অবস্থানকারী কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি তাঁর কাছে অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন,তখন আমরা তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারতাম ।**

চারিত্রিক গুণাবলী

সহজলভ্যতা	আয়েশা (রাঃ) বলেন: নবী (সাঃ) কে যখনই (আল্লাহ্‌রপক্ষ থেকে) দুটো কাজের মধ্যে ইখতিয়ার (একটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ) দেয়া হত, তখন তিনি তন্মধ্যে সহজতরটিকে বেছে নিতেন, যতক্ষণ না সেটা গুনাহ্‌র কাজ হত। যদি তা গুনাহ্‌র কাজ হত তবে তিনি তাথেকে অনেক দূরে থাকতেন।
স্ব প্রতিশোধ অগ্রহণকারী	আয়েশা (রাঃ) বলেন: আল্লাহর কসম, রাসূল (সাঃ) কখনও তাঁর ব্যক্তিগত কারণে কোন কিছুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র হারামসমূহকে ছিন্ন করা হত। সেক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিশোধ নিতেন।
খাদ্যদ্রব্যের অনিন্দুক	আয়েশা (রাঃ) বলেন : রাসূল (সাঃ) কোন সময় কোন খাদ্যকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেতেন না হলে বাদ দিতেন।
হাদিয়াহ গ্রহণকারী	আয়েশা (রাঃ) বলেন : রাসূল (সাঃ) হাদিয়া (উপহার) কবুল গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন।
সাদকাহ ভক্ষনকারী	রাসূল (সাঃ) বলেছেন : তুমি কি জান না যে, মুহাম্মাদের বংশধর (বনূ হাশিম) সদকা ভক্ষণ করে না।
নম্রতা	উক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন : এক ব্যক্তি নবী (সাঃ) এর নিকট এসে কথা বলতে গিয়ে ভয়ে কাঁপতে শুরু করল । তিনি তাকে সাহস দিয়ে বলেন: তুমি শান্ত হও, প্রকৃতিস্থ হও। কারন আমি তো কোন বাদশা নই, বরং আমি এমন মায়ের পুত্র, যে (মক্কার বাতহাতে) রোদে শুকনো গোশত খেতো।
পারিবারিক সেবা	আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ (রাঃ) বলেন: আমি 'আয়িশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী (সাঃ) ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বললেন, সংসারের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিজনের সহায়তা করতেন। আর সালাতের সময় হলে সালাতে চলে যেতেন।
জাহেলদের ব্যাপারে অভ্রুক্ষেপী	রাসূল (সাঃ) বলেছেন : তোমরা কি অবাক হও না? আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে আমার উপর আরোপিত কুরাইশদের গালি ও অভিশাপকে দূরীভূত করছেন? তারা আমাকে নিন্দিত ভেবে গালি দিচ্ছে, অভিশাপ করছে অথচ আমি মুহাম্মাদ চির প্রশংসিত।

চারিত্রিক গুণাবলী

সততা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : সত্যবাদী- বিশ্বস্ত হিসাবে স্বীকৃত রাসূল (সাঃ) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

পরিচারকের সাথে আচরণ

আনাস (রাঃ) বলেন : **আমি ১০ বছর রাসূল (সাঃ) এর খিদমাত করেছি। আল্লাহর শপথ, কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তিনি কখনো আমার কোনো কাজে 'উহ্' শব্দটি পর্যন্ত করেননি এবং আমি করেছি এমন কোন কাজের ব্যাপারে তিনি কখনো বলেননি 'এটা কেন করেছো? আর না করার ব্যাপারেও তিনি কখনো বলেননি 'ওটা কেন করনি'?** ।

সাহাবীদের থেকে কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য বর্জনকারী এবং প্রশস্ত ও উদারচিত্তের অধিকারী

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন : একদা আমরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় ঢুকল। মসজিদে (প্রাঙ্গণে) সে তার উটটি বসিয়ে বেঁধে দিল। অতঃপর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সাঃ) কে? আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তখন তাদের সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা বললাম, 'এই হেলান দিয়ে বসা ফর্সা রঙের ব্যক্তিটিই হলেন তিনি। অতঃপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র! নবী (সাঃ) তাকে বললেন: **'আমি তোমার জওয়াব দিচ্ছি।** লোকটি বলল, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি রাগান্বিত হবেন না। তিনি বললেন **'তোমার যেমন ইচ্ছা প্রশ্ন কর।** সে বলল, 'আমি আপনাকে আপনার রব এবং আপনার পূর্ববর্তীদের রবের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহই কি আপনাকে সকল মানুষের রাসূলরুপে পাঠিয়েছেন?' তিনি বললেন: **'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।'** সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন: **'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।'** সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রমযান) সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেনঃ **'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।'** সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব সদাক্বাহ (যাকাত) আদায় করে গরীবদের মাঝে ভাগ করে দিতে?' নবী (সাঃ) বললেন: **'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।'** অতঃপর লোকটি বলল, 'আমি ঈমান আনলাম আপনি যা (যে শরী'য়াত) এনেছেন তার উপর। আর আমি আমার কওমের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইব্নু সা'লাবা, বানী সা'আদ ইব্নু বক্র গোত্রের একজন।

খাদ্য গ্রহণীয় রুচি

আয়েশা (রাঃ) বলেন: **ধারাবাহিক দুই দিন মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরিবারবর্গ যবের রুটি তৃপ্ত হয়ে আহার করেননি। এই অবস্থায়ই রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকাল হয়ে যায়।**

চারিত্রিক গুণাবলী

দুনিয়া অপ্রিয়তা

নবী (সাঃ) বলেন: **আমার নিকট এ উহুদ পরিমান সোনা হাক, আর তা ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে রেখে দেয়া ব্যতিত একটি দীনারও তা থেকে আমার কাছে জমা থাকুক আর এ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হোক তা আমাকে আনন্দিত করবেনা । বরং আমি তা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এভাবে এভাবে এভাবে বিতরণ করে দিব।**

কোমলভাষী

আয়েশা (রাঃ) বলেন : **রাসূল (সাঃ) অশ্লীল ও কটুভাষী ছিলেন না, ভান করেও তিনি অশ্লীল কথা বলেননি। তিনি কখনো বাজারে গিয়ে শোরগোল করতেন না এবং অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের বদলা নিতেন না। বরং তিনি উদার মন নিয়ে ক্ষমা করে দিতেন।**

কোন অপরিচিতা নারীর হাত স্পর্শ করতেন না

আয়েশা (রাঃ) বলেন : **রাসূল (সাঃ) এর হাত কোন দিন কোন (অপরিচিতা) মহিলার হাত স্পর্শ করেনি।**

আবাসস্থল ও জীবনযাত্রা

উমার (রাঃ) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি তখন খেজুর পত্র নির্মিত একটি চাটাইয়ের উপর কাত হয়ে শোয়া ছিলেন। আমি সেখানে বসে পড়লাম। তিনি তাঁর চাদরখানি তাঁর শরীরের উপরে টেনে দিলেন। তখন এটি ছাড়া তাঁর পরনে অন্য কোন বস্ত্র ছিল না আর তার পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। এরপর আমি স্বচক্ষে রসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সামানাদির দিকে তাকালাম। আমি সেখানে একটি পাত্রে এক সা' (আড়াই কেজি পরিমাণ) এর কাছাকাছি কয়েক মুঠো যব দেখতে পেলাম। অনুরূপ বাবলা জাতীয় গাছের কিছু পাতা (যা দিয়ে চামড়ায় রং করা হয়।) কামরার এক কোণায় পড়ে আছে দেখলাম। আরও দেখতে পেলাম ঝুলন্ত একখানি চামড়া যা পাকানো ছিল না। তখন তিনি বলেন, এই সব দেখে আমার দু' চোখে অশ্রু প্রবাহিত হলো। তিনি (সাঃ) বললেন, **হে খাত্তাবের পূত্র! তুমি কাঁদছো কেন?** আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী! আমি কেন কাঁদবো না। এই যে চাটাই আপনার পাঁজরে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে আপনার ধনভান্ডার। এখানে সামান্য কিছু যা দেখলাম তা ছাড়া তো আর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে ঐ যে রোমক বাদশাহ ও পারস্য সম্রাট, কত বিলাস ব্যসনে ফলমূল ও ঝরণায় পরিবেষ্টিত হয়ে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর মনোনীত প্রিয় বান্দা। আর আপনার ধনভান্ডার হচ্ছে এই। তখন তিনি বললেন, **হে খাত্তাবের পূত্র! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাতের স্থায়ী সুখ-শান্তি আর ওদের জন্য রয়েছে পার্থিব ভোগ বিলাস।** আমি বললাম, নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট।

প্রথম প্রশ্নপত্র

প্রশ্ন	সত্য	মিথ্যা
১। বান্দার উভয় জগতের সুখ-সমৃদ্ধি নবী (সাঃ) এর জীবনাদর্শের উপর নির্ভরশীল ।	☐	☐
২। রাসূলগণ সম্ভ্রান্ত বংশে প্রেরিত হন।	☐	☐
৩। রাসূল (সাঃ) এর পূর্ণাঙ্গ গুনাবলির বিবরণ যা দ্বারা তিনি স্বয়ং নিজেকে বিশেষিত করেছেন "আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল" ।	☐	☐
৪। নরম কাপড় কিংবা রেশমির কাপড় নবী (সাঃ) এর হাতের তালু অপেক্ষা অধিকতর নরম	☐	☐
৫। আল্লাহ তাঁর নাবীর (সাঃ) মাঝে চারিত্রিক গুনাবলির পূর্ণতা ও উত্তম মেজাজের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এবং তাঁকে জ্ঞান, অনুকম্পা, এবং দুনিয়া ও আখিরাতী জীবনে যার মাঝে মুক্তি, সফলতা ও সুখ-সমৃদ্ধি রয়েছে তাও তাঁকে প্রদান করেছেন। যা বিশ্বজগতের কাউকে দেন নি।	☐	☐
৬। নবী (সাঃ) উম্মী (নিরক্ষর) ছিলেন, পড়তে ও লেখতে জানতেন না। কোন মানব তাঁর শিক্ষক ছিল না ।	☐	☐

১। সামগ্রীকভাবে কে ছিলেন জমনিবাসীদের মধ্যে বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব?

১. ইউনুস বিন মাত্তা ☐ ২. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ☐

৮। নবী (সা:) এর নামসমূহ : ১। নবী (সাঃ) এর প্রত্যেকটি নামই গুনবাচক নাম ☐ ২। আবার শুধু এমন নামবাচক নাম নয়, যা তাঁর শুধু পরিচায়ক ☐ ৩। নামগুলো এমন সব গুনাবলি থেকে উৎপন্ন যা তাঁর প্রশংসা ও অনুপম পূর্ণত্বের জোরালো দাবী রাখে ☐ ৪। উপরের সবকটি ☐ ৫। প্রথম ও তৃতীয়টি ☐

৯। নবী (সাঃ) এর চরিত্রই ছিল কুরআন, এর ব্যাখ্যা ১। কুরআনিই ছিল তাঁর সন্তুষ্ট হওয়ার মানদণ্ড ☐ ২। কুরআনিই ছিল তাঁর অসন্তুষ্ট হওয়ার মানদণ্ড ☐ ৩। উপরোক্ত উভয়টিই ☐

১০। আল্লাহুর পরম বন্ধু কে? ১। ইবরাহীম (আঃ) ☐ ২। মুহাম্মাদ (সাঃ) ☐ ৩। উভয়ই ☐

১১। রাসূল (সাঃ) ছিলেন শ্রভ্র উজ্জ্বল বর্ণের, এর ব্যাখ্যাঃ ১। গোধূমবর্ণ ☐ ২। শুভ্রজ্জ্বল ☐ ৩। অত্যন্ত শুভ্রজ্জ্বল ☐

১২। সুগন্ধির সেরা সুগন্ধি কোনটি? ১। কুস্তরী সুগন্ধি ☐ ২। রাসূল (সাঃ) এর ঘাম ☐

১৩। রাসূল (সাঃ) এর দৈহিক গঠন মাঝারি গড়নের ছিল, এর ব্যাখ্যা কি? ১। মাঝারি গঠন আকৃতিসম্পন্ন ☐

২। লম্বা গঠন আকৃতিসম্পন্ন ☐

১৪। মোহরে নবুয়ত? ১। উভয় কাধের মাঝখানে ☐ ২। গায়ের রং সদৃশ ☐ ৩। কবুতরের ডিম সদৃশ ☐ ৪। উপরের সবকটিই ☐

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা বাছাই করেছেন :	কিনানা	বনু হাশেম	ইসমাঈল	কুরাইশ বংশ থেকে
১। কিনানাকে যে বংশধর থেকে	☐	☐	☐	☐
২। কুরাইশকে যে বংশধর থেকে	☐	☐	☐	☐
৩। বনু হাশেমকে যে বংশধর থেকে	☐	☐	☐	☐
৪। নবী (সাঃ) কে যে বংশধর থেকে	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর বংশধারা :	নবীর নাম	পিতা	দাদা	দাদামহ	পূর্ব ঊর্ধ্বতন দাদা	ঊর্ধ্বতন দাদা
১. হাশেম	☐	☐	☐	☐	☐	☐
২. আ: মুত্তালিব	☐	☐	☐	☐	☐	☐
৩. আব্দুল্লাহ	☐	☐	☐	☐	☐	☐
৪. মুহাম্মাদ	☐	☐	☐	☐	☐	☐
৫. ইসমাইল	☐	☐	☐	☐	☐	☐
৬. ইবরাহীম	☐	☐	☐	☐	☐	☐

প্রতিটি বিশেষ্যকে উল্লিখিত উপযুক্ত বিশ্লেষণের সাথে সংযুক্ত করো।	মুহাম্মাদ	আহমাদ	আল আকেব	আস সিরাজ
১। আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রশংসিত	☐	☐	☐	☐
২। দাহন ছাড়া আলো বিচ্ছুরণকারী	☐	☐	☐	☐
৩। অত্যধিক বৈশিষ্টের অধিকারী প্রশংসিত	☐	☐	☐	☐
৪। যার পরে আর কোন নবী নেই, তিনি সর্বশেষ নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত	☐	☐	☐	☐

নবী (সাঃ) মানুষদের মধ্যে ছিলেন:	হাতের তালু	সুঘ্রানের দিক দিয়ে	অন্তরঙ্গতায়	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শারিরীক সৌন্দর্য	পরহেজগার
১। অধিকতর সুষমাময়ী	☐	☐	☐	☐	☐
২। অত্যাধিক নরম	☐	☐	☐	☐	☐
৩। অধিক সুবাসিত	☐	☐	☐	☐	☐
৪। সর্বোত্তম ছিলেন	☐	☐	☐	☐	☐
৫। দৃঢ়পদ ছিলেন	☐	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) :	আল্লাহর জন্য	খাদ্য-দ্রব্যকে	নিজের জন্য	দান	হাদিয়া
১।প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না	☐	☐	☐	☐	☐
২।প্রতিশোধ নিতেন	☐	☐	☐	☐	☐
৩। মন্দ বলতেন না	☐	☐	☐	☐	☐
৪।গ্রহণ করতেন এবং প্রতিদান দিতেন	☐	☐	☐	☐	☐
৫।গ্রহণ করতেন না	☐	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর

দিক-নির্দেশনা

পোশাক-পরিচ্ছেদ, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়দ্রব্য প্রসঙ্গে

পছন্দের বর্ণ বা রং	রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় রঙ ছিল সাদা । তিনি বলেছেন : **তোমাদের জন্য উত্তম পোষাক হচ্ছে সাদা রংয়ের পোষাক। অতএব তোমরা সাদা রংয়ের পোশাক পরিধান করো এবং তা দিয়ে মৃতদের কাফন দাও।**
পরিধেয় পোশাক	সহজলভ্য যে কোন পোষাক পরিধান করতেন। কখনো পশমের, সুতি আবার কখনো লিলেনের। তিনি সবসময়ই ডান দিক হতে পোষাক পরা আরম্ভ করতেন।
মাঝারী মানের বস্ত্র পরিধান	কতিপয় সালাফ বলেন : তাঁরা খুব উন্নতমানের আবার খুব নিম্নমানের জামা প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্য পরিধান করা অপছন্দ করতেন। ইবনু উমার (রাঃ) এর হাদীসে এসেছে : **যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যতি লাভের জন্য পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিবেন**। কেননা সে অহমিকা ও অহংকারের সহিত কাপড় পরিধান করে থাকে। যার ফলে আল্লাহ তায়ালা সাজা প্রদান করবেন। তদ্রূপ ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : **যে ব্যক্তি অহংকারের সহিত পরিহিত কাপড় টাখনুর নিম্নভাগে ঝুলিয়ে পরবে, আল্লাহ্ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না ক্বিয়ামাতের দিন** ।
খাদ্যদ্রব্য	উপস্থিত যে কোন খাবার, ফিরিয়ে দিতেন না এবং অনুপস্থিত যে কোন খাবারের জন্য কষ্ট পেতেন না। যে কোন পবিত্র খাবার তাঁর সামনে পেশ করা হলে, তা ভক্ষন করে নিতেন। তবে খাবার তার অভিরুচিসম্পন্ন না হলে হারামের হুকুমদান ব্যতীত পরিহার করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন : **রাসূল (সাঃ) কখনো কোন খাদ্যকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেতেন না হলে বাদ দিতেন**। যেমন গুইসাপ আহারে অভ্যস্ত না থাকায় তা পরিহার করেছিলেন।
খাদ্যগ্রহন পদ্ধতি	১. অধিকাংশ সময় মাটির উপর বিছানো দস্তরখানায় তাঁর খাবার রাখা হতো। ২. তিন আঙুল দিয়ে আহার করতেন। ৩. হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহন করতেন না। ৪. খাদ্য গ্রহণের শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলতেন। ৫. খাদ্য গ্রহন শেষে আঙুলগুলো ভাল করে চেটে নিতেন।
পানীয় পান	১. তিনি অধিকাংশ সময় বসে পান করতেন। বরং দাড়িয়ে পান করা থেকে নিষেধ করেছেন। বসে পান করার প্রতিবন্ধক কোন ওজর থাকলে দাঁড়িয়ে পান করা বৈধ আছে। ২. তিনি পান করার পর অবশিষ্টাংশ তাঁর ডান পাশের ব্যক্তিকে দিতেন। যদিও বাম পাশের ব্যক্তি ডান পাশের ব্যক্তির চেয়ে বয়সে বড় হয়।

বিবাহ-শাদী ও অন্তরঙ্গতা

১. রাসূল (সাঃ) বলেন : **তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধীকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে এবং সালাতকে করা হয়েছে আমার চক্ষুশীতলতা।**

২. তিনি স্ত্রীদের মাঝে রাত্রীযাপন, থাকার জায়গা ব্যবস্থাকরণ ও ভরণপোষণের ব্যাপারে বন্টন করে নিতেন।

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন : **রাসূল (সাঃ) সফরের ইচ্ছা করলে স্ত্রীদের মধ্যে কুর'আর মাধ্যমে সিধান্ত গ্রহন করতেন। এবং এতে যার নাম আসত তিনি তাঁকেই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বাকীদের জন্য কিছুই নির্ধারণ করতেন না।**

৪. স্ত্রীদের সাথে তাঁর পুরো জীবন ছিল চমৎকার অন্তরঙ্গতা ও নৈতিকতা সমৃদ্ধ।

৫. তিনি আয়েশা (রাঃ) কে আনসার কন্যাদের নিকট খেলা করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তিনি যখন অনিষিদ্ধ কিছুর আবদার করতেন, তিনি তাঁর আবদার রক্ষা করতেন।

৬. তিনি আয়েশা (রাঃ) এর কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কখনো তিনি ঋতুবতি অবস্থায় থাকতেন।

৭. ঋতুবতী হলে রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশের ফলে তিনি ইযার পরিধান করতেন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে মিলনবিহীন সম্ভোগ করতেন।

৮. সিয়ামরত তাঁকে চুম্বন করতেন।

৯. তাঁকে খেলার ব্যবস্থা করে দিতেন এটি তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহৃদয়তা ও চারিত্রিক উন্নত বৈশিষ্টের অন্যতম উদাহরন। এবং সফরে থাকাকালীন সময়ে নবী (সাঃ) তাঁর সাথে দু'বার দৌড় প্রতিযোগিতা করেন। তাঁরা দুজন একবার একজনের পিছনে আরেকজন চলে গৃহ থেকে বের হয়ে ছিলেন।

১০. তিনি যখন সফর থেকে বাড়ী ফিরতেন তখন রাত্রি বেলায় চুপিসারে পরিবারের নিকট আসতেন না। এবং তিনি রাতের বেলা পরিবারের কাছে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

শয়ন ও জাগরণের নির্দেশিকা

১. তিনি যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতেন তখন এই দুআ পড়তেন : **"বিসমিকা আল্লাহুম্মা আহইয়া ও আমুতু" (অর্থঃ হে আল্লাহ আমি আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি, এবং আপনার নামেই জীবিত হই)। এবং প্রতি রাতে রাসূল (সাঃ) শয্যা গ্রহনকালে সূরা ইখ্লাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্রিত করে হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে তাঁর দেহের সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন। তিনি যখন শোয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর ডান হাত গালের নীচে রেখে নীচের দুআটি তিনবার পড়তেন : "আল্লাহুম্মা ক্বিনী 'আযাবাকা ইয়াওমা তাব'আসু ইবাদাকা" (অর্থঃ হে আল্লাহ যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন, সেদিন আপনার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করবেন)।** তিনি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন বলতেন, **"আল্হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্ইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা-ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর" অর্থাৎ- "যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদানের পর আবার আমাদের পুনর্জীবিত করছেন। আর প্রত্যাবর্তন তার পানেই ।** অতঃপর তিনি মেসওয়াক করতেন।

শয়ন ও জাগরণের নির্দেশিকা

২. তিনি রাত্রির প্রথমাংশে ঘুমাতেন এবং শেষাংশে শয্যা ত্যাগ করতেন। কখনো রাতের প্রথমাংশ মুসলমানদের কল্যানসাধনে বিনিদ্র থাকনে।

৩. ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর আঁখিদ্বয় ঘুমাতো, কিন্তু অন্তর সজাগ থাকত।

৪. তিনি স্বেচ্ছায় জাগ্রত না করা পর্যন্ত কেউ তাঁকে জাগ্রত করতেন না।

৫. তিনি যাথার্থ ঘুম ঘুমাতেন এবং যেটি ছিল সবচেয়ে ফলোদপাদক।

পারস্পরিক আচরণ

১. রাসূল (সাঃ) মানুষদের সাথে রসিকতা করতেন। এবং রসিকতার মধ্য দিয়ে সত্যেটাকে উপস্থাপন করতেন।

২. কৃত্রিম আচরণ (ভান) করতেন, কিন্তু ভান করার মধ্যে অসত্য বলতেন না।

৩. তিনি পরামর্শ দিতেন এবং গ্রহনও করতেন।

৪. অসুস্থদেরকে দেখতে যেতেন, জানাযায় উপস্থিত হতেন, দাওয়াত কবুল করতেন এবং বিধবা, মিসকিন ও অপারগদের পাশে দাড়াতেন।

৫. কবির কাছ থেকে স্তুতি কাব্য শ্রবণ করতেন এবং তার জন্য উপহার দিতেন। তাঁর ভূয়সী তারিফের কিয়দংশই গাওয়া হতো। তিনি ছাড়া অন্যদের প্রশংসা অধিকাংশই অসত্য।

৬. নিজ হাতে পায়ের জুতা সেলাই করেছেন এবং কাপড়ে তালিও লাগিয়েছেন। স্বহস্তে বালতি মেরামত করেছেন, বকরীর দুধ দোহন করেছেন এবং কাপড় ধৌত করেছেন। নিজ ও পরিবার-পরিজনের পরিচর্যা করেছেন। মসজিদ নির্মানে সাহাবা কেরামের সাথে ইট বহন করেছেন।

৭. কখনো ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেধেছেন। আবার কখনো পরিতৃপ্ত হয়েছেন।

৮. মেযবান হয়েছেন, মেহমানও হয়েছেন।

৯. মাথার মধ্যভাগে, পায়ের পশ্চাদ্ভাগে, ঘাড়ের দুটি রগে এবং স্কন্ধমূলে শিঙা লাগিয়েছেন।

১০. চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন, অন্যকে আগুনের দ্বারা দাগ দিয়েছেন, তবে নিজে দাগ দেননি। অন্যকে ঝাড়ফুঁক করেছেন, তবে অন্যের কাছে থেকে ঝাড়ফুঁক গ্রহন করেননি। রোগীকে কষ্টদায়ক বস্তু থেকে সুরক্ষিত করেছেন।

১১. তিনি পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। এবং তিনি যখন কোন কিছু ঋন নিতেন, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছু দ্বারা ঋন পরিশোধ করতেন।

চলনপদ্ধতি

১. সকল মানুষের মাঝে তিনি ছিলেন সর্বাধিক দ্রুততর, শ্রেষ্ঠতর ও শান্তশিষ্ট পদব্রাজক।

২. তিনি সাহাবিদের অপেক্ষা দ্রুততর পদব্রাজক ছিলেন। তাঁর সাথে পথ চলা তাদের বেশ কষ্টসাধ্য হত।

৩. কখনো খালি পায়ে আবার কখনো জুতা পরিহিত অবস্থায় পদব্রজে চলতেন।

৪. সাহাবীরা (রাঃ) সামনে চলতেন আর তিনি তাদের পিছনে পিছনে চলতেন।

৫. তিনি সাহাবীদের সঙ্গে হাঁটার সময় একজন করে কিংবা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে হাঁটতেন।

জিকির আজকার

সকল মানুষের মাঝে তিনি ছিলেন আল্লাহর পূর্ণাঙ্গতর জিকিরকারী। অধিকন্তু, তাঁর সকল কথা-বার্তা ছিল আল্লাহর স্মরণে এবং আল্লাহকে খুশী করে এমন পূণ্যকর্মে নিবেদিত।

ঘুম থেকে জাগ্রত হলে, সালাত সূচনাকালে, বাড়ী প্রস্থানকালে, মাসজিদে প্রবেশকালে, সকাল-সন্ধ্যায়, পোষাক পরিধানকালে, পৃহে প্রবেশ ও প্রস্থানক্ষণে, টয়লেটে প্রবেশকালে, ওযুর আগে ও পরে, আযান শ্রবণকালে, নতুন চাঁদ দর্শনকালে, খাওয়ার আগে ও পরে এবং হাঁচির সময়েও তিনি আল্লাহর জিকির করতেন।

স্বভাবগত নিয়মরীতি সংক্রান্ত

স্বভাবগত নিয়মরীতি এর সংখ্যা

রাসূল (সাঃ) বলেছেন : **দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভূক্ত : ১. গোঁফ খাটো করা, ২. দাড়ি লম্বা করা, .৩ মিসওয়াক করা, ৪. নাকে পানি দিয়া ঝাড়া, ৫. নখ কাটা, ৬. আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, ৭. বগলের পশম উপড়ে ফেলা, ৮. নাভীর নীচের পশম মুন্ডন করা এবং ৯. পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা। রাবী দশম কাজটি ভুলে গেছেন।**

ডান পার্শ্ব থেকে শুরু করা

রাসূল (সাঃ) জুতা পরা, চুল আচঁড়ানো, পবিত্রতা অর্জন করা এবং কোন বস্তু আদান-প্রদান করা এমনকি সকল কাজই ডান দিক হতে শুরু করা পছন্দ করতেন। খাদ্য ভক্ষন , পানীয় পান ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য ডান হাত এবং শৌচকার্য এবং আবর্জনা পরিষ্কার করতে বাম হাত ব্যবহার করতেন।

মাথা মুণ্ডন করা

মাথা মুণ্ডনের ব্যাপারে তাঁর সুন্নাত হচ্ছে, পূর্নাঙ্গ কেটে ফেলা নতুবা সবটুকু রেখে দেওয়া।

মিসওয়াক করা

রাসূল (সাঃ) মিসওয়াক করতে খুব পছন্দ করতেন। সিয়াম রাখা ও না রাখা উভয় অবস্থাতেই মিসওয়াক করতেন। ঘুম থেকে জাগ্রতকালে, ওজুর সময়, সালাত আদায়ের পূর্বে এবং বাড়ীতে প্রবেশকালে তিনি মিসওয়াক করতেন। আরাক নামক গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করতেন।

সুগন্ধি ব্যবহার

তিনি বেশি বেশি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করাকে খুব পছন্দ করতেন।

দাড়ি ও গোঁফ

রাসূল (সাঃ) বলেন : **তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করবেঃ দাড়ি লম্বা রাখবে, গোঁফ ছোট করবে।**

সময় নির্ধারণ

আনাস (রাঃ) বলেন : **নবী (সাঃ) আমাদের জন্য নখ কাটা ও গোফ ছাঁটার সময়সীমা অন্তত চল্লিশ দিনে একবার নির্ধারণ করে দিয়েছেন ।**

কথা-বার্তা, হাসি-কান্না ও ভাষণের পদ্ধতি

কথা-বার্তা

১. আয়েশা (রাঃ) বলেন : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের ন্যায় চটপটে তথা অস্পষ্টভাবে তারাতারি কথা বলতেন না, বরং তাঁর প্রতিটি কথা ছিল সুস্পষ্ট। আর শ্রোতারা খুব সহজেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত।**

২. অধিকাংশ সময় কথা বোধগম্য হওয়ার জন্য তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন এবং সালাম দেওয়ার সময় তিনবার সালাম দিতেন।

৩. তিনি কখনো অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না এবং সংক্ষিপ্ত-সমৃদ্ধ কথা বলতেন।

৪. তিনি কখনো নিরর্থক কথা বলতেন না। কেবলমাত্র নেকীর প্রত্যাশায় কথা বলতেন।

৫. রাসূল (সাঃ) কখনো অশ্লীল, অসাদাচারী এবং শোরগোলকারী ছিলেন না।

হাসি

তাঁর হাসি ছিল মুচকি হাসি। শেষ বয়সে হাসার সময় তাঁর পেষণদন্ত (মাড়ীর দাঁত) পরিলক্ষিত হতো।

কান্না

১. কখনো তিনি চিৎকার করে এবং দারাজ গলায় কান্না করেন নি। অথচ তাঁর অশ্রু সিক্ত হয়ে ভেসে যেত। তাঁর বুকে কান্নার মৃদু শব্দ শোনা যেত।

২.তাঁর কান্না কখনো মৃত্যু ব্যক্তির উপর রহমতের জন্য এবং কখনো উম্মতের উপর ভয় ও করুনার জন্য। আবার কখনো আল্লাহর ভয়ে এবং কোরআন শ্রবণকালে ক্রন্দন করতেন।

বক্তৃতা

১. তিনি ভূখন্ড, মসজিদের মিম্বার, উট ও উষ্ট্রীর উপরে আরোহন করে বক্তৃতা দিতেন।

২. জাবের (রাঃ) বলেন : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খুত্‌বা দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ হত, স্বর উঁচু হত এবং কঠোর রাগ প্রকাশ পেত। মনে হত তিনি যেন আক্রমনকারী বাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন।**

৩. খুতবার প্রাক্কালে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করার মাধ্যমে খুতবা শুরু করতেন।

৪. রাসূল (সাঃ) শ্রোতাদের প্রয়োজনমুখী ও সংশোধনমূলক বক্তৃতা প্রদান করতেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র

প্রশ্ন	সত্য	মিথ্যা
১। তিনি যখন পোশাক পরতেন, তখন ডান দিক হতে পরা শুরু করতেন।	☐	☐
২। অধিকাংশ সময় তাঁর আহার মাটির উপর বিছানো দস্তরখানায় রাখা হতো এটাই ছিল তাঁর খাবার টেবিল।	☐	☐
৩। তিনি যখন সফর থেকে বাড়ী ফিরতেন, তখন রাত্রি বেলায় চুপিসারে পরিবারের নিকট প্রবেশ করতেন না। এবং তিনি রাত্রি বেলা পরিবারের কাছে অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন্	☐	☐
৪। কখনো ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। আবার কখনো পরিতৃপ্ত হয়েছেন।	☐	☐
৫। চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন, অন্যকে আগুনের দ্বারা দাগ দিয়েছেন, তবে নিজেকে দাগ দেননি।	☐	☐
৬। শয়তানী কুমন্ত্রণায় বিদ'আতীরা প্রস্রাব করার পর যে নিন্দনীয় কার্য-কর্ম করে থাকে, তেমন নবী (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় কখনো করেন নি। যেমন পুরুষাঙ্গ টানাটানি করা, পীড়াপীড়ি করা, ঝাপাঝাপি করা, দড়ি দিয়ে বেধে রাখা, উপর দিকে হয়ে ধাপে ধাপে ওপরে ওঠা, মূত্রনালীতে তুলা ভরে রাখা, একটু পরপর দেখাদেখি করা ও পানি গড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি কুমন্ত্রকদের বিদআতি শরিয়তবিরোধি কার্যক্রম।	☐	☐
৭। নবী (সাঃ) একনিষ্ঠতা ও উদারতায় প্রেরিত, দু'টি বিষয়ে ছিলেন বিরোধী : ১। শিরক, ২। হালালবস্তুকে হারামকরণ।	☐	☐
৮। তাঁর সন্তান-সন্ততি ছিল সাতজন। তিন ছেলে, চার মেয়ে।	☐	☐
৯। রাসূল (সাঃ) এর সকল সন্তান বিবি খাদিজার গর্ভজাত। এছাড়া অন্য কোন বিবির গর্ভজাত সন্তান হয়নি।	☐	☐
১০।রাসূল (সাঃ) এর সকল সন্তান তাঁর পূর্বেই শৈশবে ইন্তেকাল করেন।	☐	☐
১১। রাসূল (সাঃ) তাঁর ৯ জন স্ত্রী জীবিত থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, এতে কোন মতাবিরোধ নেই। তারা হচ্ছেন যথাক্রমে : ১। আয়েশা, ২। হাফসা, ৩। যয়নব বিন জাহশ, ৪। উম্মে সালামা, ৫। সফিয়্যা, ৬। উম্মে হাবীবা, ৭। মায়মুনা, ৮। সাওদা, ৯। জুয়াইরিয়া।	☐	☐
১২। আল্লাহ তায়ালা তাঁর পক্ষ থেকে জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে খাদিজা (রাঃ) এর নিকট সালামে পাঠিয়েছেন। এটি এমন এক বিশিষ্টতা, যা তিনি ব্যতীত অন্য কোন নারীর ক্ষেত্রে জানা যায় না।	☐	☐

১। রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় রঙ ছিল: ১.সাদা ☐ ২. কালো ☐ ৩.হাতের লাগানে পাওয়া যে কোন রঙ ☐

১৪। রাসূল (সাঃ) এর পোশাক-পরিচ্ছেদের নীতিমালা হচ্ছে : ১.পশমের তৈরি পোষাক পরতেন না ☐ ২.সুতি এবং শনের তৈরি কাপড় পরতেন ☐ ৩.হাতের নাগালে পাওয়া যে কোন কাপড় পরতেন ☐ ৩. ১ম ও ২য় টি ☐

১৫। রাসূল (সাঃ) এর পোশাক-পরিচ্ছেদের নীতিমালা হচ্ছে : ১. দামী কাপড় পরিধান করা ☐ ২. তপশ্যার কারণে জরাজীর্ণ কাপড় পরা ☐ ৩. মাঝারিমানের কাপড় পরিধান ☐

১৬। রাসূল (সাঃ) কখন বিসমিল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ বলতেন? ১.খাবারের শুরুতে ☐ ২. শেষে ☐ ৩. শুরুতে এবং শেষে ☐

১৭। রাসূল (সাঃ) এর অধিকাংশ সময় পানের ধরণ ছিল : ১.বসে ☐ ২.দাড়িয়ে ☐ ৩. উভয়ই অবস্থায় ☐

১৮। রাসূল (সাঃ) বলেন : দুনিয়াবী বস্তুর মধ্যে আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে: ১. স্ত্রী ☐ ২. সুগন্ধী ☐ ৩. উপরের উভয়টিই ☐

১৯। রাসূল (সাঃ) বলেন : আমার আঁখির প্রশান্তি রাখা হয়েছে: ১. জান্নাতে ☐ ২.সালাতে ☐ ৩. উভয়টিই ☐

২০। রাসূল (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে পুর্ণ জীবন কাটিয়েছেন: ১.সৌহার্দ্যপুর্ণভাবে ☐ ২.উত্তম চরিত্রে ☐ ৩. উপরের উভয়টিই ☐

২১। আনাস রাঃ বলেন : নবী (সাঃ) আমাদের জন্য নখ কাটা ও গোফ ছাঁটার সময়সীমা অন্তত..... একবার নির্ধারণ করে দিয়েছেন ।: ১.৩০ দিন ☐ ২. ৪০ দিন ☐ ৩. ৫০ দিন ☐

২২। মাথা মুণ্ডনের ব্যাপারে তাঁর সুন্নাত ছিল, ১.মাথার কিছু অংশ কাটা আর কিছু অংশ রেখে দেওয়া ☐ ২. হয় সম্পূর্ন কামিয়ে ফেলা নয়তবা সবটুকু রেখে দেওয়া ☐

২৩। রাসূল (সাঃ) মেসওয়াক করা পছন্দ করতেন, তিনি মেসওয়াক করতেন : ১.রোযা না রাখা অবস্থায় ☐ ২.রোযা রাখা অবস্থায় ☐ ৩. উভয় অবস্থায় ☐

২৪। রাসূল (সাঃ) হাসি : ১.সম্পূর্ণ মুচকি ☐ ২.অধিকাংশ মুচকি ☐

২৫। রাসূল (সাঃ) প্রেরিত হয়েছেন : ১.সকল মানুষের জন্য ☐ ২. সাকালাইন জ্বিন ও মানুষের জন্য ☐

২৬। সামগ্রীকভাবে রাসূল (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠ কন্যা ছিলনে: ১.সকলেই ☐ ২.ফাতেমা (রাঃ) ☐ ৩. যয়নব (রাঃ) ☐

২৭। রাসূল (সাঃ) এর উপর কোন স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো শয্যায় শায়িত থাকাবস্থায় ওহী অবতীর্ণ হয়নি?

১. হাফসা (রাঃ) ☐ ২. উম্ম সালামাহ (রাঃ) ☐ ৩. আয়েশা (রাঃ) ☐

রাসূল (সাঃ):	জানাযায়	দাওয়াত	বিধবা, মিসকিন ও অপারগদের পাশে	অসুস্থ
১. সেবা-শুশ্রুষা করতেন	☐	☐	☐	☐
২. উপস্থিত হতেন	☐	☐	☐	☐
৩. গ্রহণ করতেন	☐	☐	☐	☐
৪. দাড়াতেন	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর কার্যাদি :	বকরীর	মসজিদ নির্মানে ইট	স্বহস্তে কাপড়ে	স্বহস্তে জুতা	নিজের ও পরিবারের
১. মেরামত করেছেন	☐	☐	☐	☐	☐
২. তালি লাগিয়েছেন	☐	☐	☐	☐	☐
৩. দুধ দোহন করেছেন	☐	☐	☐	☐	☐
৪. পরিচর্যা করেছেন	☐	☐	☐	☐	☐
৫. বহন করেছেন	☐	☐	☐	☐	☐

স্বভাবগত ফিতরাত: ১. কাটা ২. লম্বা করা ৩. কাটা ৪. উপড়িয়ে ফেলা ৫. কামিয়ে ফেলা	নখ	বগলের পশম	নাভীর নিচের চুল	দাড়ি	গোঁফ
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

খাবারদ্রব্যে রাসূল (সাঃ) এর রীতিনীতি : ১। ফিরিয়ে দিতেন না ২। কষ্ট পেতেন না ৩। যে কোন পবিত্র খাবার তাঁর সামনে পেশ করা হলে ৪। তবে খাবারের সাথে অভিরুচি না মিললে	অনুপস্থিত খাবার	তৎক্ষনাৎ আহার করে নিতেন	হারামের হুকুম না লাগিয়ে পরিহার করতেন	উপস্থিত খাবার
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) : ১। কয়টি আঙ্গুল দ্বারা খেতেন ২। আঙুল চেটে খেতেন ৩। সবথেকে ভদ্রোচিত ৪। কেননা অহংকারী ব্যক্তি আহার করে ৫। এবং লালসীত লোভী ব্যক্তি আহার করে	খাবার শেষে	খাদ্য গ্রহণ	এক আঙ্গুল দিয়ে	পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে আত্মতৃপ্তি দূর করে	তিন
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

বৈশিষ্ট্যসমূহ

বৈশিষ্ট্যসমূহ

একনিষ্ঠ ও বদান্যচিত্তে প্রেরিত	ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাঝে একনিষ্ঠতা ও উদারতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তিনি তাওহীদের ব্যাপারে ছিলেন একনিষ্ঠ, ঠিক তেমনি চারিত্রিকভাবে ছিলেন উদার । দুটি বিষয়ে ছিলেন প্রতিদ্বন্দী : ১। শিরক, ২। হালালকে হারামকরণ।
জ্বিন ও মানুষের নিকট প্রেরিত	রাসূল (সাঃ) বলেন : **প্রত্যেক নবী নির্দিষ্ট কওম বা গোত্রের জন্য প্রেরিত হয়েলিন ,আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সকল মানুষের জন্য।**
নাযিলকৃত গ্রন্থ ও দাওয়াতি-কর্মপন্থা	আল্লাহ তায়ালা বলেন : **আলিফ-লাম-রা, এটি একটি কিতাব, আমরা এটা আপনার প্রতি নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষদেরকে তার রবের অনুমতিক্রমে বের করে আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, পরাক্রমশালী, সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে** (সূরা ইব্রাহীম-১)।
নিদর্শনসমূহ	তাঁর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে 'আল-কুরআন'। পূর্ববর্তী নবী এবং রাসূলদেরকে প্রদত্ত যে কোন নিদর্শনের বিরাট একটি অংশ তাকেও প্রদান করা হয়েছিল।
তাকে ভালোবাসা দ্বীনের একটি অঙ্গ	রাসূল (সাঃ) বলেন : **তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।**
তাকে অপছন্দকারীর বিধান	তাঁর প্রতি বিদ্বেশ পোষণকারী জঘন্যতম কুফুরকারী একজন কাফের। আল্লাহ তায়ালা বলেন : **নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেশ পোষণকারীরাই তো নির্বংশ** (সূরা কাওসার-৩)।
আল্লাহর পরম বন্ধু	রাসূল (সাঃ) বলেন : **আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর খলীল বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন যেমনিভাবে খলীল বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন ইব্রাহীমকে (আঃ)।**
উলুল আজম নবীদের একজন	আল্লাহ তায়ালা বলেন : **আর স্মরণ করুন, যখন আমরা নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহন করেছিলাম এবং আপনার কাছ থেকেও আর নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মারইয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও** (সূরা আল আহযাব-৭)।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

জ্ঞান

রাসূল (সাঃ) বলেন : **শুনে রাখো! আমি তোমাদের থেকে আল্লাহর ব্যাপারে অধিক বেশি জ্ঞাত।**

আল্লাহ তায়ালা বলেন : **আপনি বলুন : আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে, আর আমি আমি গায়েবও জানিনা। এবং তোমাদেরকে এও বলি না যে, আমি ফেরেশতা** (সূরা আল আন-আম-৫০)।

তার আনুগত্যকারী ও বিরুদ্ধাচারণকারীর বিধান

আল্লাহ তায়ালা বলেন : **বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন** (সূরা আল ইমরান-৩১)। অন্যেত্রে আরো বলেন : **আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও** (সূরা আল ইমরান-১৩৯)।

রাসূল (সাঃ) বলেন : **তোমাদের প্রত্যেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে। তারা বললেনঃ কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন : যারা আমার অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করল।**

তিনি আরো বলেন : **অপমান ও লাঞ্চনা রাখা হয়েছে আমার আদেশের বিরোধীদের জন্য।**

উম্মাত

আল্লাহ তায়ালা বলেন : **তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্যে যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে** (সূরা আল ইমরান-১১০)।

রাসূল (সাঃ) বলেন : **শপথ ঐ মহান সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, তোমরা বেহেশতীদের অর্ধেক হবে।**

ভূখণ্ড বা নগরী

রাসূল (সাঃ) এর নগরী হচ্ছে মক্কা। আল্লাহ তায়ালা বলেন : **নিশ্চয় মানবজাতীর জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, বরকতময় ও সৃষ্টিজগতের দিশারী হিসেবে। তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্রাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্ব করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর যে কেউ কুফুরী করল সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন** (সূরা আল ইমরান:৯৬-৯৭)

আর মক্কা হচ্ছে সম্মানিত শহর। রাসূল (সাঃ) বলেন : **আল্লাহ তা'আলা এ শহরকে সম্মানীত করেছেন যেদিন তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন সেদিন থেকে। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত আল্লহ তায়ালা এ শহরের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখবেন।**

এ নগরী কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য। রাসূল (সাঃ) বলেন : **মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নেই।**

বৈশিষ্ট্যসমূহ

কিবলা

কা'বা অভিমুখে তাঁর কেবলা । তার পূর্বে বায়তুল মাক্বদিস এর দিকে ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন : **অবশ্যই আমরা আকাশের দিকে আপনার বার বার তাকানো লক্ষ্য করি। সুতরাং, অবশ্যই আমরা আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে চেহারা ফেরান এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের চেহারাসমূহকে এর দিকে ফিরাও** (সূরা আল বাক্বারাহ-১৪৪)।

জমিনে সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ হচ্ছে মাসজিদুল হারাম। আবু যর (রাঃ) বলেন: **আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন মসজিদটি দুনিয়ায় সর্বপ্রথম স্থাপিত? তিনি বললেন, মাসজিদুল হারাম।**

রাসূল (সাঃ) আরো বলেন : **যে ব্যক্তি এ (কাবা) ঘরে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) আসে, এবং অশালীন কথা-বার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকে, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হজ্জ থেকে ফিরে আসবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।**

তিনি আরো বলেন : **মসজিদে হারামে (কাবায়) এক ওয়াক্ত সালাত অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ সালাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) এক ওয়াক্ত সালাত এক হাজার সালাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আর বায়তুল মাক্বদিস মসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত পাঁচশত গুণ উত্তম।**

তিনি আরো বলেন : **মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসূল এবং মসজিদুল আক্সা (বায়তুল মুকাদ্দাস) তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাতের) উদ্দেশে উটের পিঠে হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করা যাবে না)।**

তিনি আরো বলেন : **তোমরা প্রসাব বা পায়খানা করতে গেলে ক্বিবলার দিকে মুখ করে কিংবা কিবলাকে পিছনে রেখে বসবে না, বরং পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরে বসবে।**

নিকটাত্মীয় ও স্ত্রীগণ

তাঁর সন্তান-সন্ততি ছিল সাতজন : তিন ছেলে ও চার মেয়ে

১। ক্বাসেম। তার নামেই রাসূল (সাঃ) কে আবুল ক্বাসেম উপনামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

২। যয়নব (রাঃ)

৩। রুক্বায়য়া (রাঃ)

৪। উম্মে কুলসুম (রাঃ)

৫। ফাতেমা (রাঃ)

৬। আব্দুল্লাহ। তার উপাধি ছিলো তাইয়েব ও তাহের।

৭। ইবরাহীম। তিনি নবী (সাঃ) এর উপপত্নী মারিয়া কিবতিয়া এর সন্তান। বাকী সকল সন্তান ছিলেন বিবি খাদিজার গর্ভ থেকে। এছাড়া অন্য স্ত্রীদের গর্ভ থেকে সন্তান হয়নি।

ফাতেমা (রাঃ) ব্যতীত সকল সন্তান রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন । আর ফাতেমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের ছয় মাস পরই ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধৈর্য ও ছওয়াবের প্রত্যাশা দেখে সুউচ্চ স্তরে সমুন্নত করেছেন যা বিশ্ব-রমণীদের উপর মর্যাদাপূর্ণ করেছে। আর সাধারণার্থে তিনিই ছিলেন তাঁর কন্যাদের মধ্যে সেরা। অবশ্য কন্যারা সবাই ইসলামের যুগ পেয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহন এবং তাঁর সাথে হিজরত করার গৌরব অর্জন করেন।

তাঁর পিতৃব্যবর্গ ছিলেন এগারজন

১। হামজা (রাঃ) (শহীদগনের নেতা)

২। আব্বাস (রাঃ)

৩। আবু তালেব। (তার নাম আবদে মানাফ)

৪। আবু লাহাব, (তাঁর নাম : আব্দুল উজ্জা)

৫। যুবায়ের

৬। আব্দুল কাবাহ

৭। আল-মুক্বাওয়িম

৮। জিরার

৯। ক্বুসাম

১০। মুগীরা, তার উপাধি নাম হাজাল

১১। গায়দাক্ব, তার নাম: মুসাব

হামজা এবং আব্বাস (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেননি।

তাঁর ফুফুবর্গ ছিলেন ছয়জন

১। সফিয়্যা, তিনি যুবায়ের বিন আওয়াম এর মাতা।

২। উম্মু হাকিম আল-বায়জা

৩। আতিকা

৪। বাররাহ

৫। আরওয়া

৬। উমায়মা

স্ত্রীগণের নাম (সাংকেতিক চিহ্ন: حجز. صخر. سمعه)	حجز	الحاء : হাফসা বিনতে উমার বিন খাত্তার (রাঃ) الجيم: জুয়াইরা বিনতে হারিস (রাঃ) الزاي: যয়নব বিনতে জা্হশ+যয়নব বিনতে খুজায়মা (রাঃ)
	صخر	الصاد: সফিয়্যা বিনতে হুয়ায় বিন আখতাব (রাঃ) الخاء: খাদিজা বিনতে খুওয়ালিদ (রাঃ) الراء: উম্ম হাবিবা রুমলা বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ)
	سمعه	السين: সাওদা বিনতে যামআ (রাঃ) الميم: মাইমুনা বিনতে হারিস (রাঃ) العين: আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাঃ) الهاء : উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে উমায়য়া (রাঃ)
খাদিজা (রাঃ)		খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ আল-কুরাশি আল-আসাদি রাসূল (সাঃ) এর সর্বপ্রথমা স্ত্রী। রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে নবুয়তের পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন খাদিজা (রাঃ) বিবির বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রাসূল (সাঃ) অন্য কোন মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। ইবরাহীম ব্যতীত রাসূল (সাঃ) এর সকল সন্তান তাঁর গর্ভজাত ছিল। এবং তিনিই রাসূল (সাঃ) কে নবুয়তপ্রাপ্তিতে শক্তি যুগিয়েছেন এবং তাঁর সাথে চেষ্টা চালিয়েছেন। মন-প্রাণ ও ধন-সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল (আঃ) মাধ্যমে তাঁকে সালাম পাঠিয়েছেন। এটি এমন এক বিশিষ্টতা, যা তিঁনি ব্যতীত অন্য কোন নারীর ব্যাপারে জানা যায় না। তিঁনি হিজরতের তিন বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন।
সাওদা (রাঃ)		খাদিজা (রাঃ) এর ইন্তেকালের কিছুদিন পরেই রাসূল (সাঃ) সাওদা বিনতে যামআর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিঁনিই তাঁর নির্ধারিত দিন আয়েশা (রাঃ) -কে উপহার দিয়েছিলেন।
আয়েশা (রাঃ)		সাওদা (রাঃ) এর পরে রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিকের কন্যা আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। যার নিষ্কলুষতার স্বীকৃতি সাত আসমানের উপর থেকে ঘোষিত হয়েছে । তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর প্রিয়তমা। রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে জিবরাইল (আঃ) একখানা সবুজ রেশমী কাপড়ে তাঁর প্রতিচ্ছবি প্রদর্শন করিয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন : ইনি আপনার স্ত্রী।

আয়েশা (রাঃ)	(নবুয়তের একাদশ বর্ষের) শাওয়াল মাসে রাসূল (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে হিজরতের প্রথম বছর শাওয়াল মাসে বাসর সম্পন্ন করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। রাসূল (সাঃ) তাঁকে ব্যতীত আর কোন কুমারী নারী বিবাহ করেননি। আয়েশা (রাঃ) ব্যতিত অন্য কারো শয্যায় শায়িত থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়নি। আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকট সৃষ্টিজগতের সর্বাধিক প্রিয়তমা ছিলেন।তাঁর কৈফিয়তনামা আসমান থেকে নাযিল হয়েছে। তাঁকে দোষারোপকারী কাফের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উম্মতের সমস্ত উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। রাসূল (সাঃ) এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন মাসআলার ব্যাপারে অধিক বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। বরঞ্চ সাধারণার্থে উম্মতে মোহাম্মাদীর সকল রমণীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ও বিদ্বান। অধিকন্তু, শীর্ষস্থানীয় সাহাবীরা তাঁর অভিমতের দিকে ফিরে যেত এবং তাঁর নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করতেন।
হাফসা (রাঃ)	এরপর হাফসা বিনতে উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । তিনি তাঁর প্রথম স্বামী খুনাইস ইবনে হোযাফা আস-সাহমীর সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন এবং মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর স্বামী উহুদ যুদ্ধের পরে মৃত্যুবরণ করার ফলে রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।
যয়নব বিনতে খুজায়মা	তারপর রাসূল (সাঃ) যয়নব বিনতে বিনতে খুযায়মা বিন হারিস আল-ক্বায়সিয়্যা কে বিবাহ করেন। তিনি বনু হেলাল বিন আমের গোত্রের অন্তর্গত । তিনি রাসূল (সাঃ) এর নিকট বিবাহ বন্ধনের দুইমাস পর ইন্তেকাল করেন। আর তাঁকেই উম্মুল মাসাকিন (মিসকিনদের জননী) উপাধি প্রদান করা হয়।
উম্মে সালামা (রাঃ)	এরপর তিনি উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমায়্যা আল-কুরাশিয়্যা আল-মাখযুমিয়্যা কে বিবাহ করেন। আবু উমায়্যার নাম হচ্ছে : হুজায়ফা ইবনুল মুগীরা। রাসূল (সাঃ) এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী স্ত্রী। তিনি ৬২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
জুয়াইরা (রাঃ)	তারপর রাসূল (সাঃ) জুয়াইরা বিনতে হারিস বিন আবু জিরার আল-মুসত্বালিকিয়্যা (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । জুয়াইরা (রাঃ) বনু মোস্তালেক গোত্রের যুদ্ধবন্দীদের একজন ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এর নিকটে এসে দাসমুক্তির নির্ধারিত অর্থ চেয়ে সাহায্য কামনা করেন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) তাঁর নির্ধারিত মুক্তিপণ পরিশোধ করে তাঁকে মুক্তির ব্যবস্থা করতঃ তাঁকে বিবাহ করনে।

যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)

এরপর তিনি বনু আসাদ বিন খুযায়মা গোত্রের মহিলা যয়নব বিনতে জাহশকে বিবাহ করেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এর ফুফা উমায়মা এর মেয়ে ছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলছেন : **অতঃপর যখন যায়েদ তার স্ত্রী যয়নবের সাথে প্রয়োজন শেষ করল, তখন আমরা তাকে আপনার নিকট বিয়ে দিলাম (সূরা আল-আহযাব-৩৭)।**

এ কারনে তিনি (যয়নব (রাঃ) অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে এ বলে গর্ব করতেন যে, **তোমাদেরকে বিয়ে দিয়েছে তোমাদের পরিবার, আমার আমাকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমানের ওপরে বিয়ে দিয়েছেন।** তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ : স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানের ওপরে তাঁর ওলী হয়ে রাসূল (সাঃ) এর সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) এর খেলাফতের শুরুর দিকে ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রথমে রাসূল (সাঃ) এর পালকপুত্র যায়দ ইবনে হারেসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধিত ছিলেন। অতঃপর যায়েদ (রাঃ) তালাক দেওয়ায় পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা যয়নবকে রাসূল (সাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। যার ফলে উম্মতের লোকেরা পরবর্তীতে পালকপূত্রদের স্ত্রীদের বিবাহ করার বৈধতা গ্রহণে রাসূল (সাঃ) এর স্থাপিত আদর্শ গ্রহন করতে পারে।

উম্মে হাবিবা (রাঃ)

এরপর রাসূল (সাঃ) উম্মে হাবীবা (রাঃ) কে বিয়ে করেন। তাঁর নাম ছিল : রমলা বিনতে আবু সুফিয়ান সাখর বিন হারব আল-কুরাশিয়্যা আল-আমাবিয়্যা। রাসূল (সাঃ) তাঁকে আবিসিনীয়ায় হিজরতরত অবস্থায় বিবাহ করেন। বাদশা নাজ্জাশী তাঁর পক্ষ থেকে রাসূল (সাঃ) এর জন্য চারশত দিনার মোহর নির্ধারণ করেছিলেন। যা তাঁর কাছে সেখান থেকে আনা হয়ে ছিল। উম্মে হাবীবা (রাঃ) তাঁর ভাই মুয়াবিয়া (রাঃ) এর খেলাফতের সময়কালে ইন্তেকাল করেন।

সফিয়্যা (রাঃ)

অতঃপর রাসূল (সাঃ) বনু নাযির গোত্রের সর্দার মুসা (আঃ) এর সহোদর হারুন বিন ইমরান (আঃ) এর বংশভূত সফিয়্যা বিনতে হুয়ায় বিন আখতাব (রাঃ) কে বিবাহ করেন। তিনি একজন নবীর বংশীয় তনয়া পাশাপাশি আরেকজন নবীর পত্নী। তিনি বিশ্বের সর্বাধিক সুন্দরী নারী ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এর নিকট যুদ্ধবন্দী হিসেবে ছিলেন। তারপর নবী (সাঃ) তাঁকে নিজের জন্য পছন্দ করেন এবং মুক্ত করে দিয়ে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এবং তাঁর মুক্তিপ্রদানকে মোহররুপে গণ্য করেন। ফলশ্রুতিতে এটি সুন্নাহরুপে পরিণত হয়ে যায়।

মায়মুনা (রাঃ)

এরপর তিনি মায়মুনা বিনতে হারিস আল-হিলালিয়্যা (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রাসূল (সাঃ) স্ত্রী হিসেবে তাঁকেই সর্বশেষ বিবাহ করেন। মক্কা নগরীতে কাযা ওমরা শেষ করে এহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর নবী (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করেন।

এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর সময় স্ত্রীদের ৯ জন জীবিত ছিলেন, । রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর ২০ হিজরিতে যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) সর্বপ্রথম মৃত্যু বরণ করে তাঁর সাথে সঙ্গ দেন। আর সর্বশেষ মৃত্যু বরণ করেন উম্মে সালামা (রাঃ)। তিনি ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া এর খেলাফত এর সময় ৬২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

জীবন-চরিত

প্রথম অধ্যায় :
নবুয়তের পূর্বের জীবন

জন্ম

হিজরতের ৫৩ বছর পূর্বে রবীউল আওয়াল মাসের সোমবার মোতাবেক ৫৭১ খ্রীস্টাব্দে মক্কায় হস্তীবাহিনী ঘটনার বছর রাসূল (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য মক্কা থেকে হস্তীবাহিনীকে রোধ করণের মাধ্যমে তাঁকে ও তাঁর বংশকে বিশেষ হাদিয়া প্রদান করেছেন ।

পিতা

পিতা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। রাসূল (সাঃ) তাঁর মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তিনি ইন্তেকাল করেন। ফলে ইয়াতিমাবস্থায় রাসূল (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন।

মাতা

মাতা আমেনা বিনতে ওহাব। তিনি বনু জুহারা গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন। রাসূল (সাঃ) এর সাত বছর পূর্ণ না হতেই তিনিও ইন্তেকাল করেন।

দায়িত্বভার গ্রহন

তাঁর মাতা আমেনার মৃত্যুর পরে তাঁর দাদা তাঁর দায়িত্বভার গ্রহন করেন। রাসূল (সাঃ) এর আট বছরের মত বয়সে দাদাও ইন্তেকাল করেন। পরিশেষে, তাঁর চাচা আবু তালিব তার ভাতিজার দায়িত্বভার গ্রহন করেন। যার নাম ছিল আবদে মানাফ।

স্তন্যদানকারিনী

সুয়ায়বা

আবু লাহাবের দাসী। তিনি রাসূল (সাঃ) কে সহ আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ আল-মাখযুমীকেও তার কোলশিশু মাসরুহের সাথে দুগ্ধ পান করান। তিনি এই দুজনের সাথে রাসূল (সাঃ) এর চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকেও দুগ্ধপান করিয়েছেন।

হালিমাতুস সাদিয়া

তিনি রাসূল (সাঃ) কে তাঁর কোলশিশু উনাইসা এবং জুযামা -জুযামার উপাধি ছিল শাইমা- এর ভাই আব্দুল্লাহ এর সাথে দুগ্ধপান করিয়েছেন। এরা সবাই হারিস বিন আব্দুল উযযা বিন রিফায়া আস-সাদী এর সন্তান ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এর সাথে তাঁর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব কেও দুগ্ধপান করিয়েছেন।

মাতৃকোল

তাঁর মাতা আমেনা	সুওয়ায়বা, আবু লাহাবের দাসী।	হালিমা বিনতে আবু জুআয়িব আস-সাদিয়া

শাইমা

তিনি ছিলেন হালিমাতুস সাদিয়ার কন্যা এবং রাসূল (সাঃ) এর দুধবোন। তিনি হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসেছিলেন। এবং রাসূল (সাঃ) তার হক্ব আদায় করার লক্ষ্যে নিজের চাদর বিছিয়ে তাকে বসতে দেন।

মাতৃকোল

উম্মু আয়মান

তিনি বারাকাত আল-হাবশী (রাঃ)। পিতার দিক থেকে রাসূল (সাঃ) তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এর ধাত্রীও ছিলেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে তাঁর সুহৃদ যায়দ বিন হারিসা (রাঃ) এর সাথে বিবাহ দেন। ফলশ্রুতিতে তাঁর গর্ভে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) জন্ম লাভ করেন।

রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর আবু বকর এবং উমার (রাঃ) তাঁর নিকট প্রবেশ করলে তিনি কেঁদেছিলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন : তুমি কাঁদছ কেন? তাল্লাহ তায়ালার কাছে যা আছে তা কি তাঁর রাসূলের জন্য সর্বোত্তম নয়? তিনি বললেন : আমি নিশ্চিত যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট যা আছে তা তাঁর জন্য সর্বোত্তম। এবং আমি এটাও জানি যে, তিনি যে স্থানে ছিলেন তার চেয়ে উত্তম স্থানে গমন করেছেন বরং আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান থেকে আমাদের জন্য ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এ কথা তাঁদেরকে ব্যথাতুর করে তোলে। এবং তাঁরাও তাঁর সঙ্গে ক্রন্দন শুরু করেন।

পেশা

রাসূল (সাঃ) বকরী লালন পালন করেছেন। এ কাজই তাঁকে ধৈর্যশীল এবং অপারগদের প্রতি যত্নবান এবং দয়ালু বানিয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেন : **আল্লাহ্ তাআলা এমন কোন নবী পাঠাননি , যিনি বকরী চরাননি। তখন তাঁর সাহাবীগণ বলেন, আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ; আমি কয়েক কীরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।**

ব্যবসা-বানিজ্য ও বিবাহ-শাদী

রাসূল (সাঃ) যখন পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন ব্যবসায়িক কাজে তিনি সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে বসরা পৌছার পর আবার ফিরে আসেন। ফেরার পরপরই তিনি তাঁর সর্বপ্রথমা স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ কে বিবাহ করেন।

কাবাঘর পুণর্নির্মাণ

রাসূল (সাঃ) যখন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন কাবাঘরের জরাজীর্ণতা দৃশ্যিত হয়। তখন কুরায়শরা কাবা ঘর পূনর্নির্মাণ আরম্ভ করে। কুরাইশের প্রত্যেক উপগোত্র কাবাঘর নির্মাণের জন্য আলাদা আলাদা অংশ ভাগ করে নিয়েছিল। নির্মাণ কাজ যখন হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে তখন ঝগড়া বেধে যায়, এ পবিত্র পাথর যথাস্থানে কে স্থাপন করবে? চার থেকে পাচ দিন যাবত এ ঝগড়া অব্যাহত থাকে অতঃপর তারা সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আগামীকাল মসজিদুল হারামের দরজা দিয়ে যিনি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন, তিনিই তাদের মাঝে এ বিষয়ের সমাধান দিবেন। পরদিন সকালে রাসূল (সাঃ) সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করেন। এবং তিনিই তাদের মাঝে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। তখন তিনি একটি চাদর আনান এবং তা মাটিতে বিছিয়ে নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদ চাদরের মাঝে রাখেন। তারপর প্রত্যেক গোত্রের নেতাদের সে চাদরের কিনারা ধরে পাথর যথাস্থানে নিয়ে যেতে বলেন।অতঃপর রাসূল (সাঃ) স্বহস্তে যথাস্থানে পাথর স্থাপন করেন।

নিসঙ্গতা

আয়েশা (রাঃ) বলেন : **তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি হেরার গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন।** আর মূর্তি ও মূর্তিপূজক সম্প্রদায়কে তাঁর নিকট ঘৃনিত করা হয়েছিল। তাই তাঁর নিকট এর থেকে অধিক অপছন্দনীয় বিষয় আর কিছুই ছিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

ওহীর সূচনা

রাসূল (সাঃ) এর বয়স যখন ৪০ বছর পূর্ণ হয় তখন তাঁর উপর নবুয়তের জ্যোতি প্রদীপ্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা সোমবারের দিন তাঁর রিসালাত প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করেছেন।

নবুওয়াত

আয়েশা (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর নিকট নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি হেরার গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন। তারপর খাদীজা (রাঃ)-এর কাছে ফিরে এসে আবার অনুরুপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, 'পড়ুন'। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : 'আমি পড়তে জানি না। তিনি (সাঃ) বলেন : তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললন, 'পড়ুন' । আমি বললাম: আমি তো পড়তে জানি না'। তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম, 'আমি তো পড়তে জানি না'। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিন্ড থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু"- (সূরা আলাক্ব ১-৩)। তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদের কাছে এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও'। তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন । অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ) এর কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি নিজেকে উপর আশংকা বোধ করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, কক্ষনো না। আল্লাহ আপনাকে কক্ষনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যহার করেন, অসহায় দুর্বলদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্থকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রাঃ) তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকাহ ইব্নু নাওফাল ইব্নু 'আবদুল আসাদ ইব্নু 'আবদুল 'উযযাহ'র কাছে গেলেন, যিনি জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহন করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল হতে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

নবুওয়াত

খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে চাচাত ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা! তুমি কী দেখ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকাহ তাঁকে বললেন, ইনি সেই দূত যাকে আল্লাহ মূসা (আঃ) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দিবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকাহ (আঃ) ইন্তিকাল করেন। আর ওহী স্থগিত থাকে।

রাসূল (সাঃ) বলেন : আমি পথ চলতে ছিলাম, এরই মধ্যে আকাশ হতে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি আকাশের দিকে দৃষ্টি তুললাম। দেখতে পেলাম, হেরা গুহায় আমার নিকট যে ফেরেশতা এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসির উপর বসে আছেন। আমি তাতে ভীত হয়ে গেলাম। এমনকি মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম অতঃপর আমি ফিরে এসে বললাম, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর', 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, "হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, সতর্কবানী প্রচার করুন; আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন; এবং স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন; এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন"। (সূরা মুদ্দাসসির: ১-৫) এপর ওহী ধারাবাহিক অবতীর্ণ হতে লাগল।

ওহীর ধরণসমূহ

সত্য স্বপ্ন

রাসূল (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিলের সূচনা হয় সত্য স্বপ্ন দ্বারা।

আয়েশা (রাঃ) বলেন : তিনি যে স্বপনই দেখতেন, তা সকালের আলোর মতই সুস্পষ্ট হতো।

অন্তরে প্রক্ষেপণ

ফেরেশতা তাঁকে না দেখেই তাঁর অন্তরে ওহী প্রক্ষেপণ করতেন। যেমন রাসূল (সাঃ) বলেন : রুহুল আমীন আমার হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত করেছেন যে, কোন আত্মাই তার ভাগ্যে নির্ধারিত সর্বশেষ আয়ূ ও রুযী পূর্ন না করা পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে না।

মানব আকৃতিতে ফেরেশতার আগমন

রাসূল (সাঃ) বলেন : আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্ত করে ফেলি। এ পদ্ধতিতে কখনো কখনো সাহাবারা (রাঃ) ফেরেশতাকে দেখতে পেতেন।

ঘন্টাধ্বনির মত

রাসূল (সাঃ) বলেছেন : কোন সময় তা ঘন্টাধ্বনির ন্যায় আমার নিকট আসে। আর এটি-ই আমার উপর সবচেয়ে কষ্টদায়ক হয় এবং তা সমাপ্ত হতেই ফেরেশতা যা বলেন তা আমি মুখস্ত করে নেই।

আয়েশা (রাঃ) বলেন : আমি তীব্র শীতের সময় ওহী নাযিলরত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। ওহী শেষ হলেই তাঁর ললাট থেকে ঘাম ঝড়ে পড়ত। এমনকি তিনি উটের উপর আরোহিত অবস্থায় থাকলে সেটি মাটিতে বসে পড়তো।

ওহীর স্তরসমূহ

ফেরেশতা স্ব-আকৃতিতে

রাসূল (সাঃ) তাঁকে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দেখতে পেতেন। এবং ফেরেশতা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর উপর ওহী নাযিল করতেন। তাঁর সাথে এমনটি ২ বার হয়েছিলো। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা সূরা নাজমে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী

আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানের উপরে থেকে রাসূল (সাঃ) উপর সরাসরি ওহী নাযিল করেন। যেমন মেরাজ রজনীতে নামায ফরজ এবং অন্যান্য বিষয়ের ওহী নাযিল হওয়া।

আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথন

ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ) এর সাথে কথা বলেছেন। যেমনভাবে মুসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন।

সর্বপ্রথম নাজিলকৃত আয়াত

সর্বপ্রথম সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত তাঁর উপর নাযিল হয়। আয়াতসমূহ নিম্নরুপ:

১। পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। ২। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। ৩। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমান্বিত। ৪। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। ৫। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

দাওয়াতের স্তরসমূহ

১। নবুয়ত।

২। নিকটাত্মীয়দেকে সতর্কীকরণ।

৩। স্বীয় সম্প্রদায়কে ভীতিপ্রদর্শন।

৪। এমন সম্প্রদায়কে সতর্ককরন, যাদের কাছে ইতিপূর্বে কোন ভর্তিপ্রদর্শনকারী আসেননি। তারা হচ্ছে সমগ্র আরববাসী।

৫। শেষ যুগ পর্যন্ত জ্বিন ও মানুষদের মধ্য থেকে যাদের নিকট তাঁর দাওয়াত পৌছেছে, তাদের সকলকে সতর্ক করা।

দাওয়াতের পর্যায়সমূহ

১। গোপন দাওয়াত : নবুওয়তের প্রথম তিন বছর অব্যাহত থাকে।

২। প্রকাশ্য দাওয়াত : যখন তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে নির্দেশিত হন তখন দাওয়াত প্রদান শুরু করেন । আল্লাহ তায়ালা বলেন : **অতএব আপনি যে বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেনে তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন** (সূরা হিজর-৯৪)।

প্রথম ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তবর্গ

১। পুরুষদের মাঝে : আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

২। নারীদের মাঝে : খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ)

৩। শিশুদের মাঝে : আলি বিন আবু তালিব (রাঃ)

প্রথম ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তিবর্গ

৪। **আযাদকৃত গোলামদের মাঝে :** যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ)

৫। **দাস-দাসীদের মাঝে :** বেলাল বিন রেবাহ হাবশী (রাঃ)

ইসলামের কতিপয় অগ্রপথিকগণ

রাসূল (সাঃ) এর উপর প্রথম সারির ঈমান আনয়নকারী যাদের নাম আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাদের পরবর্তী ঈমান আনয়নকারীগণ হচ্ছেন :

১। উসমান বিন আফফান (রাঃ) ।

২। ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) ।

৩। যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ) ।

৪। সাদ বিন আবু ওক্কাস (রাঃ) ।

৫। আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) ।

৬। খব্বাদ বিন আরতি (রাঃ) ।

৭। সুহায়িব রুমি (রাঃ) ।

৮। আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) ।

৯। তাঁর মা সুমাইয়া (রাঃ) ।

১০। আবু উবায়দা আমির বিন জাররাহ(রাঃ) ।

১১। উসমান বিন মাযউন (রাঃ) ।

১২। আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ (রাঃ) ।

১৩। উতবা বিন গাযওয়ান (রাঃ) ।

তৃতীয় অধ্যায় :

মাক্কী যুগ

রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের উপরে মুশরিকদের নির্যাতন

যখন নবী (সাঃ) এর দাওয়াতের সত্যতা ও তাঁর চারপাশে অসংখ্য মানুষের জমায়েত মুশরিকদের নিকট লক্ষনীয় হয়, তখন তারা তাদের উপর অব্যক্ত নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের কয়েকটি চিত্র নিম্নে উল্লেখিত হলো।

১। রাসূল (সাঃ) থেকে মানুষদেরকে বিমুখি করার জন্য এবং তাঁকে দেখে ভীতিসন্ত্রস্ত করার জন্য মানুষদের নিকট জাদুকর হিসেবে মুশরিকদের গুজব রটনা করা।

২। তাঁকে পাগল হিসেবে মানুষদের সামনে উপস্থাপন করা, যাতে মানুষ তাকে নির্বোধ হিসেবে আখ্যা দেয়।

৩। তাঁকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রচার করা। আর এটা এতটাই অমূলক ছিল যে, তিনি সত্যবাদীতা ও আমানতদারিতার কারণে সকলের নিকট আল-আমীন হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

৪। তাঁকে ও তাঁর আনীত বিধানকে উপহাস করা।

৫। রাসূল (সাঃ) যখন মানুষদেরকে দ্বীনের পথে আহবান করতেন, তখন মুশরিকরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আনীত সত্যতাকে এবং ওহী শ্রবণ করা থেকে মানুষদেরকে বাধা প্রদান করার জন্য হৈচৈ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে প্ররোচিত করা।

৬। মক্কার বাহিরে থেকে হজ্জ কিংবা ওমরা পালনের জন্য আগত মানুষদেরকে মুশরিকদের স্বাগত জানানো ও নবী (সাঃ) থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ককরণ।

৭। রাসূল (সাঃ) এর শরীরে আঘাত করা। এ জঘন্যণ্যকর্ম ওকবা ইবনে আবু মুয়িত করেছিল। সে রাসূল (সাঃ) এর গলায় তার চাদর দিয়ে টেনে কণ্ঠরুদ্ধ করে হত্যা করার চেষ্টা চালায়, তখন আবু বকর (রাঃ) তাকে প্রতিহত করেন। এবং এ লোকটিই রাসুল (সাঃ) এর উপর নামাযরত অবস্থায় নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়। তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাঃ) এসে সেই নাড়িভুঁড়ি সরিয়ে ফেলেন।

৮। তারা তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে তাঁকে ইমারা বিন ওয়ালিদের বিনিময়ে হত্যার কুপ্রস্তাব পেশ করার মাধ্যমে হত্যার ষড়যন্ত্র চালায়। এমনকি রাসূল (সাঃ) হিজরতের ইচ্ছা পোষণকালে তারা তাঁকে হত্যার কুবাসনা পোষন করে।

৯। তারা দুর্বল মুমিনদেরকে ভীষণ কষ্ট ও অসহনীয় যন্ত্রনা প্রদান করে। যেমনভাবে তারা বেলাল (রাঃ) এর পেটের উপর ভারি পাথর চাপিয়ে দেন। ঠিক অনুরুপ নির্যাতন তারা আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) এর পরিবারসহ অন্যান্যদের সাথেও করেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

মুসলমানদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেতে লাগল, কাফেররা তা দেখে আশঙ্কিত হয়ে তাদের উপর নির্যাতনের প্রখরতা এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরো বাড়িয়ে দেয়। ফলে রাসূল (সাঃ) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দেন। এবং তিনি বলেন : **নিশ্চয় এ শহরের মালিকের কাছে মানুষেরা অত্যাচারিত নয়।**

প্রথম পর্যায়

প্রথম পর্যায়ে ১২ জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা হিজরত করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, উসমান বিন আফফান (রাঃ)। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর স্ত্রী রাসূল (সাঃ) এর কন্যা রোকায়া (রাঃ) কে সফরসঙ্গী করে যাত্রা করেন। এবং তাঁরা আবিসিনিয়ায় অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে ও প্রতিবেশিত্বে বসবাস শুরু করেন। কিছুদিন পরে মুসলমানদের নিকট কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পৌছায়, যা ছিল ডাহা মিথ্যা। অতঃপর তাঁরা মক্কায় ফিরে আসেন। তারা ফিরে এসে যখন দেখেন যে, অবস্থা অত্যন্ত নাযুক ও কঠিনতর তখন তাদের মাঝে থেকে কেউ কেউ আবার আবিসিনিয়ায় ফিরে যায়। অপরদিকে একটি দল মক্কায় প্রবেশ করেন। ফলে তারা কুরাইশদের কর্তৃক চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হন। মক্কায় প্রবেশকারীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলা হিজরত করেন। তাঁরা বাদশা নাজ্জাশীর নিকট অত্যন্ত ভাল অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন। এ খবর কুরাইশদের নিকট পৌছালে তারা বাদশা নাজ্জাশীর নিকট হিজরতকারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য আমর ইবনে আস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রাবিয়াকে আবসিনিয়ায় পাঠায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের ষড়যন্ত্রকে অঙ্কুরেই প্রতিহত করেন।

হামযা ও ওমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ

নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বছরে হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যুবক হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করেছেন। অতঃপর নবী (সাঃ) এর দুআর বরকতে ওমার বিন খাত্তাবও (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। মুমিনরা উভয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী হন এবং কুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি পান।

শিয়াবে আবু তালিব

কুরাইশরা তাদের অত্যাচার ও নির্যাতন আরো বাড়িয়ে দেয়। এমনকি রাসূল (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে ৩ বছর আবু তালেবের গিরিপথে অবরুদ্ধ করে রাখে। সেই গিরিপথে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং কাফেররা রাসূল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে ভীষণ কষ্ট পায়। আর এ অবরুদ্ধ থেকে বের হওয়ার সময় রাসূল (সাঃ) এর বয়স ছিল উনপঞ্চাশ বছর।

আবু তালেব ও খাদিজা (রাঃ) এর মৃত্যু	এর কয়েক মাস পর রাসূল (সাঃ) এর চাচা আবু তালিব ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। অনুরুপভাবে এর কিছু দিন পরেই খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। ফলে কাফেরদের নির্যাতন আরো কঠিন আকার ধারণ করে।
তায়েফ গমণ	আল্লাহর পথে দাওয়াত দানের লক্ষ্যে রাসূল (সাঃ) এবং যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ) তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। কিন্তু কেউ তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি। বরং তাঁকে কষ্ট দেয় এবং তায়েফ থেকে বের করে দেয়। এমনকি তারা তাঁকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে দুই পায়ের গোড়ালি রক্তাক্ত করে দেয়। তারপর তিনি তাদের থেকে প্রস্থান করে মক্কার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর মুতয়িম বিন আদির আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।
আদ্দাসের ইসলাম গ্রহণ	তায়েফ থেকে ফেরার পথে রাসূল (সাঃ) আদ্দাস নাসরানীর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি রাসূল (সাঃ) প্রতি ঈমান আনয়ন এবং তাঁকে সত্যায়ন করেন।
জ্বিনদের ঈমান আনয়ন	তায়েফ থেকে ফেরার সময় পথিমধ্যে নাখলা নামক স্থানে নসিবায়িন বাসীদের ৭ জন জ্বিনের একটি দলকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করা হয়। অতঃপর তারা কুরআন শ্রবণ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।
নৈশভ্রমন ও উর্ধ্বগমণ	অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বশরীর ও রুহ সহকারে বায়তুল মাক্বদিস পর্যন্ত নৈশ ভ্রমণ করানো হয়। এরপর সাত আসমানের উপর দিয়ে স্বশরীরে এবং রুহ সহকারে আল্লাহর নিকট আরোহন করানো হয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সম্মোধন করেন ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেন।
বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত	নবী (সাঃ) মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের নিকটে গিয়ে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক মৌসুমে আশ্রয় চেয়ে নিজেকে তাদের সামনে উপস্থাপন করতেন, যাতে করে তিনি তাঁর রবের রিসালাতের প্রচার প্রসার করতে পারেন। এবং যারা সেই দাওয়াত গ্রহণ করবে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। কিন্তু কোন গোত্রই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেন নি। এবং আল্লাহ তায়ালা সেই (দাওয়াত কবুল) সম্মাননা আনসারদের জন্য সংরক্ষন করে রাখেন। অতঃপর তিনি ছয়সদস্য বিশিষ্ট একটি দলের নিকটে গমনের মাধ্যমে মাক্কী জীবনের দাওয়াতের পরিসমাপ্তি টানেন। এবং তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেন ও মদীনায় ফিরে যান। পরবর্তীতে তাঁরাও তাদের গোত্রকে ইসলামের পথে দাওয়াত দেন। এমনকি ইসলাম তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং আনসারদের প্রতিটি ঘরে ঘরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর আলোচনা আলেচিত হতে বাকী থাকে না।

আনসারগণ ও বাইয়াতে আক্বাবা

আক্বাবার প্রথম শপথ

অতঃপর পরবর্তী বছর আনাসারদের ১২ জন লোক মক্কায় আগমন করেন। তন্মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন পূর্বের বছরে ইসলাম গ্রহণ করা ছয়জন যুবক। তাঁরা আক্বাবার সময় সুরা মুমতাহিনায় বর্ণিত মহিলাদের অঙ্গীকারনামার উপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর তারা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

আক্বাবার দ্বিতীয় শপথ

পরবর্তী বছর তাদের মধ্য থেকে ৩৭ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা রাসূল (সাঃ) এর নিকটে আসেন। তারাই সর্বশেষ আক্বাবার শপথ গ্রহণকারী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিকট এ কথার উপর শপথ গ্রহণ করেন যে, তারা তাঁকে ঐ সকল জিনিস থেকে সংরক্ষন করবেন যে সকল জিনিস থেকে তারা তাদের নিজেদেরকে, নিজ সন্তানদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে সংরক্ষন করে থাকেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের মধ্য থেকে ১২ জনকে মুখপাত্র নির্বাচন করেন। এবং তিনি ও তাঁর সাহাবীরা উক্ত স্থান থেকে প্রস্থান করেন।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

মাদানী যুগ

হিজরতের অনুমতি

রাসূল (সা:) তাঁর সাহাবীদেরকে মদিনায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন। ফলে তাঁরা দলে দলে গোপনে মদিনায় প্রবেশ করলেন। কথিত আছে, সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ছিলেন : আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমী। এটাও কথিত আছে, সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ছিলেন : মুসআব বিন উমায়ির। অতঃপর তারা সকলই আনসারদের বাড়িতে বাড়িতে প্রবেশ করেন, ফলে তাঁরা তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এতে করে মদীনার চতুর্দিকে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) কে হিজরতের অনুমতি প্রদান করা হয়। তিনি রবিউল আওয়াল মাসের রোজ সোমবার মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৬ বছর। সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং তাঁর আযাদকৃত গোলাম আমের বিন ফুহায়রা। তাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন আরীকাত লাইসী। সে এবং আবু বকর (রাঃ) গারে সওর পৌঁছানোর পর তাঁরা সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন। অতঃপর তারা (লোহিত সাগরের) উপকূলীয় পথ অনুসরণ করে যাত্রা করেন।

রাসূল সাঃ এর মদিনায় আগমন

১২ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার রাসূল (সা:) এবং তাঁর সহচররা মদীনায় পৌঁছান। তিনি মদিনার সর্বাধিক উঁচু ভূমি কুবা নামক স্থানে বনু আমর বিন আওফ গোত্রের নিকট অবতরণ করেন। তিনি তাদের নিকট ১৪ দিন দিনাতিপাত করেন।

ইসলামের প্রথম মসজিদ

রাসূল (সাঃ) মসজিদে কুবা নির্মাণ করেন । ইবনু ওমার (রাঃ) বলেছেন : **নবী (সাঃ) প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে আসতেন, কখনো পদব্রজে, কখনো সওয়ারীতে**। 'নবী (সাঃ) বলেন: **কুবা মাসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত পড়া একটি উমরার সমতুল্য।**

মসজিদে নববী নির্মাণ

অতঃপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহন করেন এবং পথ চলা শুরু করেন। বনু নাজ্জার গোত্রের লোকেরা তাদের গৃহে তাঁর অবতরণ কামনা করতঃ উষ্ট্রীর লাগাম ধরে নিতে শুরু করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন যে, **'উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও, কেননা সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত"**। এরপরে উটনী গমন অব্যাহত রাখে এবং বর্তমান মসজিদে নববীর স্থানে এসে বসে পড়ে । আর স্থানটি ছিল বনু নাজ্জার গোত্রের দু'জন বালক সাহাল এবং সুহাইলের উট বেধে রাখার স্থান। অতঃপর তিনি আবূ আইউব আনসারীর বাড়ির সামনে তাঁর উষ্ট্রী থেকে অবরতণ করেন। এরপর তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ উট বাধার স্থানটিতে স্বহস্তে খেজুর গাছের ডাল ও ইট-পাথর দ্বারা মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন।

মসজিদে নববী নির্মাণ

তারপর মাসজিদে নববীর পার্শ্বে তাঁর নিজের এবং স্ত্রীদের জন্য বাসস্থান তৈরী করেন। আয়েশা (রাঃ) এর গৃহ মসজিদের সর্বাধিক নিকটতর ছিল। অতঃপর এর সাত মাস পরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ আইউব আনসারী (রাঃ)-এর বাড়ী থেকে নিজ বাসস্থানে স্থানান্তরিত হন।

ভ্রাতৃবন্ধন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাসজিদে নববী নির্মাণের পর নব্বই জন মুসলিমের উপস্থিতিতে মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। পারস্পরিক সমবেদনা এবং পারস্পরিক উত্তরাধিকার বানানো মূলনীতিতে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত হয়। উত্তরাধিকারের এ ব্যবস্থা বদর যুদ্ধ পর্যন্ত চালু ছিল।

ইয়াহুদ

নবী (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, ইয়াহুদিরা নাবী (সাঃ) কে দেখে চিনতে পারে যে, ইনিই হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল (সাঃ) এবং ইনিই সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তারা তাদের কাছে সংরক্ষিত তাওরাত কিতাবে লেখা দেখতে পায়। তারপরেও তাদের মধ্যে থেকে স্বল্প সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্য থেকে ধর্মীয় পন্ডিত ও ধর্মযাজক আব্দুল্লাহ বিন সালাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর নবী (সাঃ) বানু ক্বায়নুক্বা, বানু নাযির এবং বানু কুরায়জা ইয়াহুদী গোত্রসমূহের সাথে সন্ধি করেছিলেন।

কিবলা পরিবর্তন

মেরাজে সালাতের বিধান ফরয হওয়ার পর নবী (সাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ক্বিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করতেন। আর তিনি কামনা করতেন, তাঁর কেবলা যেন কাবা ঘরের দিকে পরিবর্তিত করা হয়। আর এ লক্ষ্যেই তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে তা আকাংক্ষা করতেন। তখন আল্লাহ তায়াল এ আয়াত নাযিল করেন : **"অবশ্যই আমরা আকাশের দিকে আপনাকে বার বার তাকানো লক্ষ্য করি। সুতরাং, অবশ্যই আমরা আপনাকে এমন কেবলার দিকেই ফিরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন (সূরা বাকারা-১৪৪)** । অতঃপর রাসূল (সাঃ) ২য় হিজরীতে ক্বাবা গৃহকে ক্বিবলাহ হিসাবে রূপান্তরিত হওয়ার ঘোষনা দেন।

জিহাদের অনুমতি

নবী (সাঃ) মদিনা নববীতে স্থায়ীভাবে বসবাস এবং আনসার সাহাবীগণ কর্তৃক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করার পর আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় : **যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে আমাদের রব আল্লাহ** (সূরা হাজ্জ:৩৯-৪০)। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করলেন।

রাসূল (সাঃ) এর প্রারম্ভিক যুদ্ধাভিযানসমূহ ছিল : আবওয়া যুদ্ধ, বুওয়াত, যিল উশায়রা এবং কিছু সংখ্যক সারিয়্যা সমূহ।

বদর যুদ্ধ

২য় হিজরীর রমযান মাসে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তিন শতাধিক মুমিনদেরকে নিয়ে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী কোরাইশ কাফেলা খোঁজের উদ্দ্যেশ্যে যাত্রা করেন। অতঃপর আবু সুফিয়ান পুরো কাফেলাসহ ভিন্নপথ অবলম্বন করে এবং শয়তান কোরাইশকে প্ররোচিত করে। ফলে তারা মুমিনদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়। উভয় দল বদর প্রান্তরে মিলিত হয়। এটাই ছিল হক্ব-বাতিলের নির্ণয়কারী যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত বদর যুদ্ধ।

দুইদলের সৈন্যরা যখন যুদ্ধের জন্য মিলিত হলো , রাসুল (সাঃ) তখন স্বীয় রবের কাছে মিনতি করে দুআ করতে লাগলেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের ময়দানে মুসলিমদের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য ফেরেশতা প্রেরণের মাধ্যমে সুদৃঢ় করেন। এবং আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী এবং তাঁর কালিমাকে সমুন্নত করেন। এ যুদ্ধে বদর প্রান্তরে ৭০ জন মুশরিক নিহত হয়। এবং ১৪ জন মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন।

কায়নুকা যুদ্ধ

৩য় হিজরীতে বনু ক্বায়নুক্বা গোত্রের লোকেরা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে রাসূল (সাঃ) তাদেরকে ১৫ দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখেন। অতঃপর তারা রাসূল (সাঃ) এর হুকুম মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি দেয়। তখন রাসূল (সাঃ) তাদের উপর থেকে অররুদ্ধ নির্দেশনা উঠিয়ে নেন। এবং তারা ৭০০ জন ছিল।

উহুদ যুদ্ধ

শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদরের যুদ্ধে কোরাইশরা তাদের পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে না পেরে প্রায় ৩০০০ সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রাসূল (সাঃ) তাঁর ৭০০ জন সাহাবীদেরকে নিয়ে উহুদ প্রান্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। সে সময় মুনাফিকরা তাঁর থেকে পশ্চাৎপদতা অবলম্বন করেন ।

উহুদ যুদ্ধ

দিনের প্রথমভাগে আক্রমণের নিয়ন্ত্রন ছিল মুসলমানদের হাতে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে পরীক্ষার মুখামুখি করেন। ফলে মুসলমানরা দিশেহারা হয়ে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ মুশরিকদের হাতে চলে যায়। এমনকি তারা রাসূল (রাঃ) এর নিকটে এসে তাঁর উপর আঘাত হানেন এবং দাঁত মুবারক ভেঙ্গে ফেলেন। রাসূল (সাঃ) এর সাথে সেদিন ফেরেশতারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তন্মধ্যে হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব, মুসআব বিন উমাইর, আনাস বিন নযর এবং হানযালা আল-গাসিল প্রমুখ সাহাবীগন।

এবং এ যুদ্ধে ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ উত্তম আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এমনকি তাঁর ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বলেন : ত্বালহাহ (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে। রাসূল (সাঃ) ও মুসলমানরা পাহাড়ে জোটবদ্ধ হলেন। এবং আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের করাল থাবা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করেন।

উহুদের দিনটি ছিল বালা-মুসিবত ও পরিশোধনের দিন । আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে পরীক্ষার সম্মুখিন করেছিলেন । এবং তিনি মুনাফেকদের মুখোশ উন্মোচন করেন। এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী মুমিনদেরকে শাহাদাত এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

এ যুদ্ধের পর মুসলমানদেরকে সমূলে নিঃশেষ করার নিমিত্তে কোরাইশরা আরেক দফা বের হওয়ার সংবাদ রাসূল (সাঃ) শুনতে পান। অতঃপর সেদিন মুমিনরা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বের হয়ে যায়। আর যখন মুসলমানদের হামরাউল আসাদে পৌঁছার সংবাদ কুরাইশরা শুনতে পায়, তখন তারা নিরাশ হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে।

হিজরী চতুর্থ বর্ষ

৪র্থ হিজরীতে বীরে মাউনার ঘটনাটি সংঘটিত হয়। যেখানে কুরআনের ৭০ জন ক্বারী হাফেজ সাহাবীকে হত্যা করা হয়। আর এ বর্ষেই বানী নাযির যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে নবী (সাঃ) ইয়াহুদিদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে রাসূল (সাঃ) এর ভীতি উৎক্ষেপণ করেন। এবং নবী (সাঃ) তাদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করেন। তাদের ব্যাপারে সূরা হাশর নাযিল হয়।

মুরাইসি যুদ্ধ

৫ম হিজরীতে নবী (সাঃ) বনু মোসত্বালাক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন। এবং বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। ফেরার সময় পথিমধ্যে তায়াম্মুমের বিধান প্রবর্তিত হয়। এবং আয়েশা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে ইফক (মিথ্যা অপবাদ) এর ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মুনাফিক্বরা উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রাঃ) এর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেন। অথচ তিনি ছিলেন পূত-পবিত্রা । এ বিষয়টি রাসূল (সাঃ) ও তাঁর উপর অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্দোষিতার কথা সূরা নুরে নাযিল করেন। এবং অপবাদ রটনাকারীদের বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করা হয়।

আহযাব যুদ্ধ

৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে পরিখা খননের (আহযাব) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইয়াহুদিরা নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জন্য কোরাইশ ও তাদের বন্ধুদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন। এবং কোরাইশ, বনু সুলাইম, বনু আসাদ, ফাযারা এবং আশজাহ প্রভৃতি গোত্র থেকে ১০ হাজার সৈন্যবাহিনী একত্রিত হয়ে মদিনার মদিনার পানে যাত্রা করেন।

এদিকে সালমান ফারসী (রাঃ) নবী (সাঃ) কে আত্মরক্ষামূলক পরিখা খননের পরামর্শ দেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন হাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং সালা পর্বতকে পিছনে ও খন্দককে সামনে রেখে রেখে শিবির স্থাপন করেন। তিনি মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ বনু কুরায়যা গোত্রের নিকট নিরাপত্তার অনুরোধ করেন। পক্ষান্তরে তারা পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এমনকি শত্রুবাহিনীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে । তখন রাসূল (সাঃ) তাদের এবং শত্রুবাহিনীদের কাছে নুয়াইম বিন মাসউদ (রাঃ) কে পাঠান। তিনি তাদের সাথে কূটকৌশল অবলম্বন করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন । অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর উত্তপ্ত বায়ু প্রেরণ করেন। যা তাদের তাঁবুসমূহকে চূর্ণ করে দেয়, পাত্রসমূহকে উলটিয়ে দেয়। অতঃপর বায়ূ তাদেরকে কম্পিত করে ফেলে এবং অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে। ফলে তারা কোন গত্যন্তর ছাড়াই সেখান থেকে প্রস্থান করে। ষড়যন্ত্রের কোন প্রকার সাফল্য লাভ ছাড়াই তারা স্থানচ্যুত হয়।

রাসূল (সাঃ) বানু কুরাযায় গিয়ে সাদ বিন মুয়ায (রাঃ) কে গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত করেন।

এ যুদ্ধে সূরা আহযাব অবতীর্ণ হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

৬ষ্ঠ হিজরীতে নবী (সাঃ) ১৪০০ সাহাবাবৃন্দকে নিয়ে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। অতঃপর যখন নবী (সাঃ) যখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছান, তখন মক্কার কুরাইশরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয়। এবং তিনি তাদের সাথে এ সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, আগামী ১০ বছর উভয়ের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। বস্তুত, এ সন্ধিচুক্তি ছিল মুমিনদের জন্য স্পষ্ট বিজয়ের চাবি কাঠি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন : নিশ্চয় আমরা আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয় (সূরা ফাতহ-১)।

হুদায়বিয়া সন্ধিচুক্তির সারমর্ম হচ্ছে: আগামী বছর মুমিনদেরকে ওমরা পালন করার জন্য মক্কায় প্রবেশকালে কুরাইশরা সহৃদয়তা প্রদর্শন করবে। ফলে, ৭ম হিজরীতে যুল কাদাহ মাসে "ওমরাতুল ক্বাযা" পালিত হয়।

খায়বার যুদ্ধ

রাসূল (সাঃ) হুদায়বিয়া নামক স্থান থেকে প্রত্যাবর্তনের ২০ দিন পর মদিনার উত্তর দিকে অবস্থিত খায়বার এর উদ্দেশ্যে বের হন। সেখানে ইয়াহুদিদেরকে প্রায় ২০ দিন যাবৎ অবরুদ্ধ করে রাখেন। মুসলমানরা সেখানে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন । অতঃপর যখন ইয়াহুদিদের মনে নিশ্চিত ধ্বংসে নিপতিত হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস জাগরিত হয়, রাসূল (সাঃ) এর নিকট যুদ্ধবিরতির আবেদন করেন। এতে রাসূল (সাঃ) তাদের সাথে এ শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করেন যে, তাদের জীবন রক্ষা করা হবে এবং শুধুমাত্র গায়ে পরিহিত পোষাকসহ খায়বার থেকে বের হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি ইয়াহুদিদেরকে ফসল উৎপাদন করার জন্য জমি এ শর্তে দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে কৃষি কাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তারা গ্রহণ করবে।

জাফরের আগমন

নবী (সাঃ) খায়বারে থাকাকালীন আবু হুরায়রা (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মদিনায় আগমণ করেন। অনুরুপভাবে রাসূল (সাঃ) এর চাচা জাফর বিন আবু তালিব ও তাঁর সঙ্গীগণও যারা হাবশাতে অবস্থানরত ছিলেন তারা খায়বারে আসেন ও রাসূল (সাঃ) এর খিদমতে সমাগত হন । আশয়ারী মুসলিমগণ অর্থাৎ আবূ মুসা (রাঃ) এবং তাঁর বন্ধুগণ (রাঃ) সেদিনও উপস্থিত হয়েছিলেন।

মুতার যুদ্ধ

৮ম হিজরীতে মূতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের কারন ছিল, শুরাহবিল বিন আমর আল-গাসসানি রাসূল (সাঃ) কর্তৃক রোম সম্রাটের নিকট প্রেরিত দূতকে হত্যা করে। যার ফলে রাসূল (সাঃ) তাঁর পরম বন্ধু যায়দ বিন হারিসা (রাঃ) কে আমির বানিয়ে ৩০০০ সাহাবীর একটি বাহিনী গঠন করে রোম অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং বলেন : **যায়দ (রাঃ) শাহাদাত বরণ করলে জাফর (রাঃ) লোকদের আমির হবে। জাফর (রাঃ) শাহাদাতের লাভ করলে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা লোকদের আমির হবে।** অন্যদিকে হিরাক্বল ও তাঁর আরবীয় মিত্রবর্গ ২,০০০০০ সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হয়। অতঃপর উভয় দল মুতা নামক স্থানে মুখোমুখি হয় এবং উভয়ের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূল (সাঃ) এর সকল আমিরগণ শাহাদাত বরণ করেন । অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) পতাকা ধারণ করেন। এবং তিনি সুন্দরভাবে সৈন্যদল পরিচালনা করেন ফলে মুসলিমদেরকে পশ্চাদপদ করাতে সক্ষম হন। আল্লাহ ও তাদের শত্রুদের কবল থেকে তিনি মুসলমানদেরকে আল্লাহর সাহায্যে নিষ্কৃতি দান করতে সমর্থ হন।

বৃহত্তর মক্কা বিজয়

উক্ত বছরে তথা ৮ম হিজরীতে, কুরাইশদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ বনু বাকর গোত্রের লোকেরা নবী (সাঃ) এর সাথে মৈত্রীবদ্ধ বানু খুযায়া গোত্রের লোকদের উপর আকস্মিক আক্রমণ করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করে এবং কোরাইশরাও বনু বাকর গোত্রের লোকদেরকে গোপনীয়ভাবে সহায়তা করে। অতঃপর যখন এ সংবাদটি রাসূল (সাঃ) কাছে পৌঁছায় তখন তিনি মক্কা বিজয়ের দৃঢ় সংকল্প করেন। এদিকে আবু সুফিয়ান রাসূল (সাঃ) এর সাথে কথা বলার জন্য মদীনায় আসেন কিন্তু রাসূল তাঁর কোন কথায় কর্ণপাত করেন নি। পরিশেষে তিনি আবু বকর, ওমার ও আলী (রাঃ) এর নিকট অনুরোধ করে যাতে রাসূল (সাঃ) তার সাথে কথা বলে, এ বিষয়ে সে অনুরোধ করলেও তাঁরা তাকে অস্বীকৃতি জানিয়ে দেয়। এবং রাসূল (সাঃ) এর মক্কা অভিমুখে যাত্রার বিষয়টি কুরাইশদের নিকটে গোপন ও দৃষ্টিহীন রাখার জন্য নবী (সাঃ) আল্লাহর নিকট দুয়া করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুয়া কবুল করেন। সুতরাং রাসূল (সাঃ) ১০,০০০ সাহাবীদেরকে নিয়ে যাত্রা করে মক্কায় প্রবেশ করেন।

রাসূল (সাঃ) এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব মক্কা বিজয়ের সামান্য কিছুক্ষন পূর্বেই ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন।

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সাঃ) বলেন : **যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ এবং যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ এবং যে নিজ ঘরের দরজা ভিতর হতে বন্ধ করে নেবে সে নিরাপদ।** সেদিন রাসূল (সাঃ) যুদ্ধ করেন নি, তবে তিনি তাঁকে এবং মুসলিমদেরকে অল্পসংখ্যক কষ্টদানকারী এবং যুদ্ধের জন্য উদ্যোগগ্রহনকারীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন।

রাসূল (সা:) মক্কায় প্রবেশ করে ইহরামহীন অবস্থায় কাবা ঘর তওয়াফ করেন। অতঃপর উসমান বিন ত্বালহাহ (রাঃ)-কে ডেকে তাঁর কাছ থেকে কাবা ঘরের চাবি গ্রহণ করেন এবং তিনি কাবা ঘরের ভিতরে এবং তাঁর চতুর্দিকে অবস্থিত মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করেন। অতঃপর উসমান বিন ত্বালহাকে চাবি ফিরিয়ে দেন।

মক্কা বিজয়ের পরে অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনকি বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট প্রতিনিধিত্ব গ্রহন করেন।

মূর্তি বিনাশকরণ

আল্লাহ তায়ালা নবী (সাঃ) কে মক্কা বিজয় দান করার পর নবী (সাঃ) মক্কার চতুর্দিকে অবস্থিত মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করার জন্য তাঁর সাহাবীদেরকে প্রেরণ করেন। আমর বিন আস (রাঃ) কে "সুয়া", সাদ বিন যায়েদ (রাঃ) কে "মানাত", খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কে "উজ্জা", তুফাইল (রাঃ) কে "যিল কাফফাইন", এবং আলী (রাঃ) "তায় মূর্তি", বিনাশ করার জন্য প্রেরণ করেন।

হুনায়েন যুদ্ধ

যখন হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা মুলমানদের মক্কা বিজয়ের সংবাদ শুনতে পায় তখন তারা রাসূল (সাঃ) এর উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্য সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করে। তারা সম্পদ, স্ত্রী ও শিশু সন্তানদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেন। এদিকে নবী (সাঃ) ১২,০০০ সৈন্যেবাহিনী নিয়ে তাদের উদ্দেশ্য রওনা হন। মুসলিমদেরকে তাদের সংখ্যাধিক্যতা আনন্দিত করে তোলে। এভাবে তারা হুনায়েন উপত্যকায় এসে পৌছান। হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের উপর তীব্র আক্রমণ করে। এ আক্রমণের প্রচন্ডতা নিয়ন্ত্রন করতে না পেরে হতভম্ব হয়ে মুসলিম বাহিনী নবী (সাঃ) থেকে দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে থাকে। কিন্তু এক দল মুহাজির ও তাঁর পরিবার পরিজনেরা নবী (সাঃ) এর সাথে দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে স্থির করেন ফলে তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের উপর মুসলিমদেরকে বিজয়ী করেন এবং হাওয়াযেন গোত্র ত্বায়িফ অভিমুখে পালিয়ে যায়।

অতঃপর হাওয়াযেন গোত্রের ১৪ জন পুরুষ ইসলাম গ্রহণান্তে নবী (সাঃ) এর নিকট আসেন। তারা রাসূল (সাঃ) কে বন্দীদের উপর অনুগ্রহ কামনা করেন, ফলে তিনি তাদের প্রতি হলেন দয়ালু এবং তারাও তাঁর প্রতি হলো দয়াদ্র।

ত্বায়েফ যুদ্ধ

হাওয়াযেন গোত্রের কার্যাদি সম্পন্ন করার পর নবী (সাঃ) ত্বায়িফ যুদ্ধের সংকল্প করেন। ফলে তিনি ত্বায়িফে আসেন এবং ১৮ দিন যাবৎ ত্বায়িফ দূর্গ অবরোধ করে রাখেন। অতঃপর তিনি কোন যুদ্ধের সম্মুখিন না হয়েই ফিরে আসেন।

তাবুক যুদ্ধ

৯ম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধ (অসচ্ছলতার যুদ্ধ) সংঘটিত হয়। সময়টা ছিল প্রচন্ড গরম এবং ফলমূল সংগ্রহ ও ছায়ার জন্য বাগ-বাগিচায় অবস্থান করার মৌসুম। ফলে যুদ্ধের জন্য বের হওয়াটা লোকদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। নবী (সাঃ) যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণকালে লোকদেরকে দান করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ফলে ওসমান (রাঃ) জিনপোশ ও গদিসহ তিনশত উট ও সাথে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করেন।এমতাবস্থায় রাসূল (সাঃ) বলেন : **(আজকের পর উসমান যা কিছু করবে তাতে তার কোনই ক্ষতি হবে না।)** এবং অন্যান্য সাহাবীরা সাধ্যানুযায়ী দান করেন।

সেদিন সাধারন মোনাফেকরাও দান করতে পশ্চাৎপদতা অবলম্বন করেছিল। এ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর শীর্ষস্থানীয় তিনজন সাহাবী কোন প্রকার ওজর ছাড়াই পশ্চাদ্মুখী হয়েছিলেন। তারা হলেন যথাক্রমে :

১। কাব বিন মালেক (রাঃ) ।

২। হেলাল বিন উমায়্যা (রাঃ) ।

৩। মুরারা বিন রাবি (রাঃ) ।

তাবুক যুদ্ধ

নবী (সাঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁরা ওযর পেশ করত: তাদের ব্যাপারে সূরা তওবার আয়াত নাযিল হয়। **অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল** (সূরা তাওবা:১১৮)। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের সত্যবাদিতা অবগত হয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এবং তিনি উক্ত সূরাতে মুনাফিকদেরকে চরমভাবে তিরস্কার করেন। এবং তিনি তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। ফলে এ সূরাটিকে 'ফাজেহা' (গোমর ফাসকারী) সূরা নামে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা এ সূরাটি তাদের প্রকৃত মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছিল।

এ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) আয়লার আমিরের সাথে ভূমিকর গ্রহণের শর্তে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অনুরুপভাবে জারবা এবং আজরুহর অধিবাসীগণের সাথেও কর গ্রহণের ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে লিখিত প্রমাণ প্রত্র প্রদান করেন। নবী (সাঃ) দুমাতুল জান্দালের শাসক উকায়দেরের সাথেও সন্ধিচুক্তি স্থাপন করেন। রাসূল (সাঃ) তাবুক প্রান্তরে প্রায় ১০ দিন এর অধিক সময় অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি কোন যুদ্ধের মুখোমুখি না হয়ে মদিনায় ফিরে আসেন।

নবী (সাঃ) যখন মদিনায় ফিরে আসেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মোনাফিকদের নির্মিত মাসজিদে জিরারকে ধ্বংস করার নির্দেশ প্রদান করেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী : **(আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ, জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃস্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে)**। সুতরাং তিনি "মাসজিদে জিরার" সমূলে বিনাশ করেন। এবং এই অভিযান ছিল তাঁর স্বশরীরে অংশগ্রহণের সর্বশেষ যুদ্ধাভিযান।

প্রতিনিধি দলসমূহ

তাবুক যুদ্ধের পর সাক্বীফ গোত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এবং ৯ম বর্ষকে "প্রতিনিধি দলসমূহ আগমনের" বর্ষ অভিধায় অভিহিত করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা প্রতিনিধির আকারে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করার জন্য রাসূল (সাঃ) এর নিকট আগমন করে। তন্মধ্যে বনু তামিম গোত্রের প্রতিনিধি দল ও তাদের দলপতি আতারিদ বিন হাজেব আত-তামিমি, ত্বায় গোত্রের প্রতিনিধি দল ও তাদের নেতা যায়েদ আল-খায়েল, আবদুল ক্বায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল ও তাদের সর্দার আল-জারুদ আল-আবদী। বনু হানীফার গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং তাদের মধ্যে মুসায়লামাতুল কাজ্জাব ছিল। যে পরবর্তী সময়ে নবুওয়াতের দাবী করে।

আবু বক্কর (রাঃ) এর হজ্জ পালন

৯ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) কে আমিরুল হজ্জ (হজ্জযাত্রী দলের সর্দার) হিসেবে প্রেরণ করেন। ফলে তিনি মানুষদেরকে হজ্জের বিধিবিধান শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে হজ্জ পালন করেন। রাসূল (সাঃ) আলী (রাঃ) কে মানুষদের মাঝে সূরা তাওবার প্রথমাংশ পাঠ করার জন্য এবং মুশরিকদের সাথে সকল অঙ্গীকার প্রত্যাখান করার জন্য পাঠান। আবূ বাকর (রাঃ) মানুষদের মাঝে ঘোষণা করেন যে, এই বছরের পরে কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং জাহেলীদের ন্যায় কোন উলঙ্গ ব্যক্তি কাবা ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না।

বিদায় হজ্জ

রাসূল (সাঃ) ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জ পালন করেন। রাসূল (সাঃ) এর সাথে বিভিন্ন গোত্র ও বিবিন্ন দেশের মুসলিমরা হজ্জ পালনের উদ্দ্যেশ্যে বের হন। যাদের সংখ্যা লক্ষাধিক পর্যন্ত পৌছেছিল। রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে মানাসিকে হজ্জ (হজ্জের বিধি বিধান) শিক্ষা দেন। তিনি আরাফার দিন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং আল্লাহ তায়ালা এ-ই আয়াতটি পাঠ করেন : **আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম** (সূরা মায়েদা-৩)। এবং তিনি তাদেরকে সংবাদ দেন যে, দ্বীন পূর্ণ হয়ে গেছে। এবং কুরআন এবং সুন্নাহর আনীত জীবনব্যবস্থাকে দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরার ওসিয়ত করেন। আরো বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জান, মাল ও তাদের ইয্যত-আবরুকে তাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত করে দিয়েছেন। এবং এটিই রাসূল (সাঃ) এর বিদায়ী ভাষণে পরিণত হয়।

উসামা (রাঃ) কে সামরিক অভিযানে প্রেরণ

১১ হিজরীর সফর মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রুমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং উসামা বিন যায়দকে (রাঃ) সে দলের আমির হিসেবে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি যাত্রা করেন এবং জুর্ফ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। পরিশেষে, তাদের নিকট রাসূল (সাঃ) এর অসুস্থতার সংবাদ পৌছায়।

রাসূল (সাঃ) এর

যুদ্ধ-বিগ্রহের সার-সংক্ষেপ

রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ, সামরিক অভিযান ও সারিয়্যাহসমূহ এর সংক্ষিপ্তরূপ

রাসূল (সাঃ) এর সকল যুদ্ধ, সামরিক অভিযান ও সারিয়্যা হিজরতের পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যেই সংঘটিত হয়। আর সারিয়্যা ও সামরিক অভিযানসমূহের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ টি। পক্ষান্তরে, ২৭ টি যুদ্ধাভিযান। তন্মধ্যে ৯টি যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেন। সেগুলো হলো : ১। বদর যুদ্ধ। ২। উহুদ যুদ্ধ। ৩। খানদাক্ব। ৪। কুরায়যা। ৫। মুসত্বালিক। ৬। খায়বার ৭। মক্কা বিজয় ৮। হুনাইন। ৯। ত্বায়িফ। আর পবিত্র কুরআনে উপরোল্লিখিত কতক যুদ্ধসমূহের আলোচনা অবতীর্ণ হয়েছে। যা নিম্নে আলাচিত হলো।

কুরআনে কারীমে অবতীর্ণ রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধবিগ্রহ

বদর যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরাহ আনফাল অবতীর্ণ হয়। এ সূরাটিকে সূরা বদর নামে আখ্যায়িত করা হয়।

উহুদ যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সূরা আলে ইমরানের শেষাংশের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এই আয়াত থেকে, **আর স্মরণ করুন যখন আপনি আপনার পরিজনদের কাছ থেকে প্রত্যূষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মুমিনগণকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করেছিলেন** (সূরা আল ইমরান-১২১)। সূরার শেষাংশের সামান্য কতক আয়াত পূর্ব-পর্যন্ত।

খানদাক্ব, বনু কুরায়যা ও খায়বার যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আহযাবের প্রারম্ভাংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

বনু নাযির গোত্রের যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরাহ হাশর অবতীর্ণ হয়েছে।

হুদায়বিয়া ও খায়বার যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা ফাতহ অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত সূরায় মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এবং সূরা নাসরে বিজয়ের কথা স্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

তাবুক যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা তওবার বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) শুধুমাত্র একটি যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন আর তা হচ্ছে উহুদ যুদ্ধ। ফিরিশতাগণ তাঁর (সাঃ) সাথে থেকে বদর, উহুদ এবং হুনাইন যুদ্ধে একসাথে যুদ্ধ করেছেন। আর খানদাক্ব যুদ্ধে ফিরিশতাগণ অবতরণ করে মুশরিকদেরকে প্রকম্পিত ও পরাজিত করেন। এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মুষ্টি পাথরকুচি নিয়ে মুশকরিকদের মুখমন্ডলে নিক্ষেপ করলে তৎক্ষনাৎ তারা পলায়ন করে।

মুসলমানদের দুটি যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয় ঃ ১। বদর। ২। হুনাইন।

রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ, সামরিক অভিযান ও সারিয়্যাহসমূহ এর সংক্ষিপ্তরূপ	রাসূলে কারীম (সাঃ) ত্বায়িফের যুদ্ধে মিনজানিক (প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ) যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে যুদ্ধ করেছেন। তিনি পরিখা খনন করে আহযাব যুদ্ধে নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। সালমান ফারেসী (রাঃ) তাঁকে উক্ত পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

রাসূল (সাঃ) এর
অসুস্থতা ও মৃত্যু

অতঃপর,আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়নবী (সাঃ)-কে দুনিয়া এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যমে জান্নাত প্রাপ্তি, এ দুয়ের মাঝে কোন একটিকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেন। তিনি তাঁর সাক্ষাৎপ্রাপ্তির মাধ্যমে জান্নাত লাভকে নিজের জন্য বেছে নেন। ফলে তিনি প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন । সেবাশুশ্রূষা গ্রহণের জন্য স্ত্রীগণের নিকট আয়েশা (রাঃ) এর বাড়িতে অবস্থান করার অনুমতি চাওয়া হয়, ফলশ্রুতিতে সকলই অনুমতি দিয়ে দেন। অতঃপর যখন তিনি অসুস্থতার কারনে মাসজিদে জামাতে নামাজ পড়তে অক্ষম হন,তখন আবু বকর (রাঃ) কে লোকদের ঈমামতি করার আদেশ দেন। এবং এই আদেশ রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর খেলাফতগ্রহণে আবু বকর (রাঃ) এর অগ্রাধিকারপ্রাপ্তির ইঙ্গিত বহন করে।

একাদশ হিজরীর ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার আবূ বাকর (রাঃ)-এর ইমামতিতে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যখন ফজরের সালাতরত অবস্থায় ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরের পর্দা সরান এবং দরজা খুলে সালাতরত সাহাবীগণ (রাঃ) কে অবলোকন করেন। (আকস্মিকভাবে রাসূল (সাঃ) এর আগমন অনুভব করায় সাহাবাগণ (সাঃ)-কে তাঁর শারীরিক অবস্থাদি জিজ্ঞাসার জন্য সালাত ভঙ্গ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতের ইশারায় সালাত পূর্ণ করে নিতে বলেন। অতঃপর তাদের জন্য মৃদু হাসেন। অতঃপর যখন পূর্বাহ্নের সময় হলো, নাবী (সাঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন । তাঁর মৃত্যু ছিল মুসলমানদের উপর বৃহত্তর বিপদ, যা তাদেরকে কঠিন আকারে বিষন্নিত করে ফেলে। মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কেরাম আবু বকর (রা:) এর নিকট একত্রিত হয়ে হাতে হাত রেখে খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রবর্তীতা এবং নবী (সাঃ) এর পর সকল উম্মতের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ জানার ফলে তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করা থেকে কেউ পশ্চাদগামিতা প্রদর্শন করেন নি।

অতঃপর, রাসূল (সাঃ) কে গোসল এবং তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন পরানো হয়। অতঃপর তাঁকে আয়েশা (রাঃ) এর গৃহের যে স্থানে তিনি মৃত্যুবরন করেন সেখানেই দাফন করা হয়। নবীদেরকে মৃত্যুস্থলেই দাফন করা আল্লাহ তায়ালার একটি সুন্নাত। জ্বিন ও মানুষ সকলই আমার প্রভুর দরুদ ও সালাম তাঁর উপর বর্ষণ করুন। আমরা তাঁর যথোপযুক্ত আমানত আদায়, উম্মতকে সদুপদেশ প্রদান এবং আল্লাহর পথে যথার্থভাবে সংগ্রামীতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করছি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উম্মতের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদানস্বরুপ প্রতিদান দান করুন। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগৎ এর প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত।

পরিশিষ্ট

রাসূল (সাঃ) এর কবি হাসসান বিন সাবেত (রাঃ) বলেন ঃ

১। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে আমাদের নবীর সাথে হিংসুকদের আঁখি বিদূরিত জান্নাতে একত্রিত করুন।

২। হে মহামহিম, মহান ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী তুমি আমাদেরকে একত্রিত করো জান্নাতুল ফেরদৌসে। আর তা আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখো।

৩। আল্লাহ তায়ালার, তাঁর আরশের চারপাশে বিরাজমান (ফেরেশতাগণের) এবং পুণ্যশীল (আত্মাদের) দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, বরকতময় অধিক প্রশংসিত সত্ত্বার উপর।

তৃতীয় প্রশ্নপত্র

প্রশ্ন	সত্য	মিথ্যা
১। রাসূল (সাঃ) এর বকরী লালনপালন করা কাজই তাকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল, অপারগদের প্রতি যত্নবান এবং দয়ালু হিসেবে পরিণত করেছে।	☐	☐
২। রাসূল (সাঃ) এর ৪০ বছর পূর্ণকালে তাঁর উপর নবুয়তের আলো প্রদীপ্ত হয়। এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সোমবার দিন তাঁর রিসালাত প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।	☐	☐
৩। কুরাইশরা রাসূল (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে তিন বছর আবু তালেবের গিরিপথে অবরুদ্ধ করে নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। এ অবরুদ্ধ থেকে বের হওয়ার সময় রাসূল (সাঃ) এর বয়স ৪৯ বছর ছিল।	☐	☐

১। রাসূল (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন? ১. মক্কায় ☐ ২. হস্তী যুদ্ধের বছরে ☐ ৩. হিজরতের ৫৩ বছর পূর্বে ☐ ৪. উপরের সবকটিই ☐

২। কিসের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিল আরম্ভ হয় : ১. তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় করা মাধ্যমে ☐ ২. সত্য স্বপ্ন ☐ ৩. উপরোক্ত সবকটিই ☐

৩। ওহীর স্তর কয়টি : ১. পাঁচটি ☐ ২. সাতটি ☐ ৩. তিনটি ☐

৪। রাসূল (সাঃ) এর দাওয়াত ও তাবলীগের স্তর কয়টি? ১. দু'টি ☐ ২. তিনটি ☐ ৩. পাঁচটি ☐

৫। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বশরীর ও রুহ সহকারে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নৈশভ্রমণ করানো হয়। এবং সাত আসমানের উপর দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ..... আল্লাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালে তাঁকে সম্মোধন করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেন।

১. শুধুমাত্র স্বশরীরে ☐ ২. রুহ সহকারে ☐ ৩. স্বশরীর ও রুহ সহকারে ☐

৬। ইসলাম ধর্মের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? ১.মাসজিদুল হারাম ☐ ২. নববী ☐ ৩.আক্বসা ☐ ৪.ক্বুবা ☐

৭। ক্বেবলা পরিবর্তিত হয়েছে : ১. হিজরতের পূর্বে মক্কায় ☐ ২. হিজরীর ২য় বর্ষ ☐ ৩. হিজরীর ৩য় বর্ষ ☐

৮। বদর যুদ্ধ কোন বছরের রমযান মাসে সংঘটিত হয়? ১. হিজরীর ২য় বর্ষে ☐ ২. হিজরীর ৩য় বর্ষে ☐

রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তিবর্গ :	আলি বিন আবু তালিব	বেলাল বিন রেবাহ	যায়েদ বিন হারিসা	আবু বকর সিদ্দিক
১। পুরুষদের মাঝে	☐	☐	☐	☐
২। শিশুদের মাঝে	☐	☐	☐	☐
৩। আযাদকৃত গোলামদের মাঝে	☐	☐	☐	☐
৪। দাস-দাসীদের মাঝে	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর ভরণ-পোষণ:	আবু তালিব	আব্দুল মুত্তালিব	প্রায় আট বছর	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব	সাত বছর
১। মা আমেনার পর তাঁর দাদা দায়িত্বভার গ্রহণ করেন:	☐	☐	☐	☐	☐
২। দাদার মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল:	☐	☐	☐	☐	☐
৩। তারপর তাঁর চাচা দায়িত্বভার গ্রহণ করেন	☐	☐	☐	☐	☐
৪। রাসূল (সাঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন কার মৃত্যু হয়:	☐	☐	☐	☐	☐
৫। কত বছর বয়স পূর্ণ না হতেই মা মৃত্যুবরণ করেন:	☐	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সামরিক অভিযানসমুহ:	দশ বছর	ষাট	সাতাইশ	নয়টি	একটি যুদ্ধ
১। রাসূল (সাঃ) এর সকল যুদ্ধ, সামরিক অভিযান ও সারিয়্যা হিজরতের পরবর্তী কত বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়:	☐	☐	☐	☐	☐
২। সারিয়্যা ও সামরিক অভিযানের সংখ্যা প্রায় কতটি:	☐	☐	☐	☐	☐
৩। রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ-বিগ্রহের সংখ্যা:	☐	☐	☐	☐	☐
৪। রাসূল (সাঃ) স্বশরীরে যুদ্ধ করছেন করেছেন :	☐	☐	☐	☐	☐
৫। রাসূল (সাঃ) আহত হয়েছেন:	☐	☐	☐	☐	☐